পর দুইবৎসর বড় সুখেই তাহাদের দাম্পত্য-জীবন কাটিয়াছিল। তখন অণিমার মনে হইত—পৃথিবী শুধু আনন্দের রাজ্য? ইহার কোনখানে কোন অভাব অভিযোগ, দুঃখ বেদনা, কোন মলিনতা নাই। নিজের সৌভাগ্য-গর্ব্বে পরিপূর্ণ প্রাণমন সে তাহার পতিদেবতার পায়েই উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিল, নিজের কোন স্বাতন্ত্র্য রাখে নাই। তারপর ধীরে ধীরে তাহার সাধের ধরিত্রীর বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। এখন তাহার নয়নের হাসি অধরে নামিয়াছে; তাহাতেও বিষাদের ম্লান ছায়া ফুটিয়া থাকে। কাজকর্ম্মে সদানন্দময়ীর আর সে আনন্দভাব নাই। মিছামিছি হাসিখেলায় আর সে ছেলেমানুষি করে না। করিলে অকারণে চোখের জল এখন অনেক সময় দুর্নিবার বেগে বহিতে চায়। অনেক সময় মনে মনে সে নিজ মৃত্যু-কামনাও করিয়া থাকে। তাহার সুখের ঘরে ভূতে বাসা বাঁধিয়াছিল। শরীরের ক্লান্তিনাশ ও মনের স্ফূর্ত্তি বিধানের জন্যে কিছুদিন হইতে আদিত্যনাথ যে নূতন ঔষধ সেবন করিতে শিখিয়াছিল, তাহা এমনি অসংযত ও অশোভনরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে যে, অণিমার অনুনয় অভিমান, ক্রোধ, ক্রন্দন, কিছুতেই আর তাহা সে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিতেছিল না বরং গোপনতার লজ্জা এড়াইয়া আদিত্য তাহার স্ত্রীকে এখন আর গ্রাহ্যও করে না। স্ত্রীর অল্পবুদ্ধি ও অসংস্কৃত জ্ঞানের তুলনায়, অনেক সময় অনুকম্পার সহিত সে, তাহাকে আহা বেচারি এই কথাই মনে করিয়া থাকে। কখন বা সে তাহার স্ত্রীর প্রত্যেক ভাব-ভঙ্গিমাটি ভাবের রঙ্গে রাঙ্গাইয়া লেখার তুলিকাতে আঁকিয়া তুলে। স্ত্রীর হাসি-ক্রন্দনের রৌদ্রবৃষ্টির মধুর অভিনয়—মান-অভিমানের করুণ দৃশ্য—আদিত্যকে ব্যথা না দিয়া আনন্দ দেয়। কখনও অত্যধিক যত্নসোহাগে কখনও বিরক্তি-তাচ্ছীল্যে, কখন অত্যন্ত কাছে টানিয়া, কখন বা নিজের প্রতি অকারণে পত্নীর সন্দেহের উদ্রেক করাইয়া নারী-হৃদয়ের গোপন-মাধুর্য্য,—প্রতারিতার মর্ম্মবেদনা, ঈর্ষাপরায়ণার মনের ভাব,—সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করিয়া সে 'নোট' করিয়া রাখে। জীবন্ত আদর্শের অনুসরণে এই শক্তিশালী নবীন লেখক যে নারীচিত্র-চিত্রণে অসাধারণ দক্ষতা লাভ করিয়াছিল, সে-সম্বন্ধে কাহাকেও দ্বিধা-গ্রস্ত হইতে দেখা যাইত না।

ঘরের বাহিরে জুতার শব্দ থামিবার পূর্ব্বেই অণিমা দ্বারের দিকে মুখ ফিরাইল। তাহার শরীরের মধ্যে একটা আনন্দের বিদ্যুৎ শিহরিয়া গেল; আসন ছাড়িয়া শান্ত-কণ্ঠে সে কহিল, "এত দেরী"? স্ত্রীর প্রশ্নে উত্তর না দিয়া, হাতের ছড়ি ও মাথার টুপী টেবিলের উপর রাখিয়া আদিত্য কহিল, "—ওঃ কি গরমই পড়েছে?" হাতের তাল-পাতার পাখাখানি একটু জোরে জোরে চালাইয়া অণিমা কহিল, বাবা ত কতবারই আমাদের যাবার জন্যে লিখলেন্ তা তুমি যাবে না ত? শিমলের এখন ত সময় ভালই। "স্ত্রীর অভিমান-ক্ষুণ্ণ কণ্ঠস্বরে আদিত্য তাহার প্রতি চাহিয়া দেখিল। সংসারের অনেক ছোট, বড় জিনিষকেই সে যেমন তীক্ষ্ণ অন্তর-ভেদী দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখে, তেমনি করিয়াই সুন্দরীর হাসিমুখে কেমন

দ্রুতগতিতে বেদনার ছায়া ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহাই লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিল; স্ত্রীর কথার উত্তর-স্বরূপ কহিল, "চেষ্টা কর্‌ব পূজার সময়! তুমি ত জান, তাঁর সঙ্গে আমার মত কখনও মিল্‌লো না! গেলে আমিও সুখ পাব না, তিনিও না! নৈলে ক্ষতি কি ছিল আর!"

অণিমা গলা ঝাড়িয়া সহজ সুরে কহিল, "জল খাবে চল। কাপড় বদ্‌লাবে না?" আলস্য ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে হাই তুলিয়া আদিত্য উত্তর করিল, "না,—খাবও না, কাপড়ও বদ্‌লাব না। তা'র কারণ, এখুনি আমায় আবার বেরুতে হ'বে।" অণিমা বলিল, "খাবে না কেন? কোথাও খেয়েচ বুঝি?" অণিমার স্বর সংশয়পূর্ণ। আদিত্য কহিল "না, খাইনি কোথাও।" তদুত্তরে অণিমা বলিল, "তবে খাবে না কেন?—সেই ছাই ভস্ম খেয়েচ বুঝি?" স্ত্রীর বিরক্তিপূর্ণ মুখের পানে সগর্ব্ব দৃষ্টিপাতে স্বামী বিজয়ী বীরের মত উত্তর দিল, "কিছু,—কল্পনাকে সতেজ কর্ত্তে দুর্ব্বলমস্তিষ্কে এটা যে কত উপকারক—তা যদি একটুও বুঝ্‌তে; তা হলে এমন নেইআঁকড়ে তর্ক কর্‌তে চাইতে না।" অণিমা রাগরক্তমুখ ফিরাইয়া অস্ফুটস্বরে কহিল, "থাক্—ও আর আমায় বুঝে কাজ নেই।" কথা ফিরাইবার ইচ্ছায় আদিত্য কহিল, "বাঃ, তোমার নূতন চুড়ি দিয়েগেছে যে দেখ্‌চি!—খাসা মানিয়েচে ত?" "কিন্তু এর বিল যখন আস্‌বে তখন আর খাসা মনে হবে না। বলেছিলাম ত আমার ও-সব চাইনে!—অণিমা ঐ কথা বলিলে আদিত্য "ওঃ তাতে কি", বলিয়া, মৃদু হাসিয়া পত্নীর অভিমানপূর্ণ মুখের পানে চাহিয়া পুনরায় কহিল, "তোমায় খুসী কর্‌তে এ কি এমন বেশী অনি!"—অণিমা কহিল, "আমায় খুসী কর্‌তে চাও তুমি? সত্যি বল্‌চ? তবে ও ছাইভস্ম খাও কেন?" আদিত্য ঘড়ি খুলিয়া দেখিয়া কহিল, "বলেচি ত', কিন্তু তুমি যে আজ বড় সাজ্‌গোজ্ করে বসে আছ? কোথাও যাবে না কি? না, আস্‌বে কেউ?" অণিমা স্বামীর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলাইয়া শান্তভাবে কহিল, "আমার মনে হচ্চে আজ আমাদের বায়স্কোপ দেখ্‌তে যাবার কথা ছিল না?" আদিত্য বলিল, "ওঃ, হোঃ, তাই ত—একদম ভুলে গেছি যে!—কিন্তু আজ ত আর হোল না, তা—রমেণ যাচ্চে, আমার সঙ্গে সঙ্গীত-সমাজে, রাতে তার বাড়ী নিমন্ত্রণও আছে, ফির্‌তে ঢের রাত হ'বে আমার। তোমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পোড়ো। কখন্ ফির্‌ব কিছুই ঠিক নেই ত।" অণিমা অভিমান ভুলিয়া মিনতির সুরে কহিল, "বাঃ সে হ'বে না। আজ আমি সারাদিন ধরে খাবার টাবার সব তৈরি কর্‌লুম, তুমি খাবে না? সে হবে না।" "রাগ্ কর্‌তে হচ্চে আজ কিছুতেই খেতে পার্‌ব না, আর একদিন আবার কোরো তখন। রমেণের বোন্ নিজেহাতে আজ রান্না করে খাওয়াবেন্, খেয়ে গেলে ভারী রাগ কর্ব্বেন্। শনিবার চেঞ্জে যাওয়াই ঠিক্ করা গেছে,—গদাধরকে বোলো আমার গরমের সুটটুটগুলি যেন ইস্ত্রী করিয়ে রাখে। ফির্‌তে মাস দুই দেরী হতে পারে, শীতের কাপড় কিছু বেশী সঙ্গে থাকাই ভাল। সারাদিনের পরিশ্রম-ক্লান্ত প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্যের শোচনীয় পরিণামেকল্পনা

করিয়া অণিমার মনে যে দুঃখের মেঘ জমা হইয়া উঠিতেছিল, অনুকূল বাতাসে তাহা মুহূর্ত্তে সরিয়া মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। হর্ষোৎফুল্লকণ্ঠে সে কহিল, 'কোথায় যাব আমরা?" "আ-ম-রা" বলিয়া আদিত্য অবাক্ হইয়া কিছুক্ষণ স্ত্রীর দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "না, আমি একাই যাবো, তোমার যাওয়া ত' হ'চ্ছে না।" "একলা থাকতে পারবে?" বলিয়া অণিমা স্বামীর পানে ফিরিয়া চাহিল। আদিত্য একটুখানি ভাবিয়া কহিল, "তা চলে যাবে এক রকম। অসার কল্পনা জাগিয়ে তুলতে, দুর্ব্বল যন্তিষ্ক স্নিগ্ধ রাখতে শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্য নয়, বাইরের সকল ঝঞ্ঝাটি থেকে মুক্তি নেওয়াই হয়েছে আমার দরকার। ঘরের বাইরে হিন্দুর মেয়ে খাড়ের বোঝা বই ত' আর কিছু নয়।" অণিমা টেবিলের উপরকার মাসিকপত্রখানি তুলিয়া নাড়াচাড়া করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "তুমিই কিন্তু বলে থাকো যে স্ত্রী চিন্তারও সঙ্গী।" বক্রকটাক্ষে মাসিকপত্রের দিকে চাহিয়া আদিত্য কহিল,—"বিলক্ষণ! চিন্তা ত' তোমায় করতেই হবে সেখানে। বিরহ-সম্বন্ধে এবার সেখান থেকে যা রচনা করে আনবো,—সাহিত্যজগতে একেবারে তাক্ লেগে যাবে—তাতে।—তারপর একটু স্বর নামাইয়া পুনরায় কহিল, "তুমি ত' জান স্ত্রীভাগ্যে নিজেকে আমি ভাগ্যবান বলেই মনে করি।"

অণিমা হাতের বইখানির পাতা উল্টাইয়া কহিল, "সেখায় তুমি মেয়েদের যে রকম শ্রদ্ধা, সম্মান, অধিকার দেওয়া উচিত বল—কাজের বেলায়—!" বাক্যপূরণের অবসর না দিয়া আদিত্য বলিল, "বাঃ একেবারে আনিবেসান্ত! এই ত! কতকগুলা নভেল পড়ার এই ফল! সংসারটা বইয়ের অক্ষরে ত' আর তৈরী নয়, এটা সত্যিকার; তাই পুঁথির লেখা আর সত্যিমানুষ আকাশ পাতাল তফাৎ।" অণিমা একটা ছোট রকম নিশ্বাস ফেলিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "ভালবাসাও কি তাই? এও কি শুধু বইয়ের কথা? সত্যি কি কিছু নেই এর মধ্যে?"

স্বামী ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন, ছ'টা বাজিতে মিনিট-পনের বাকী। ঘড়িটি যথা-স্থানে রাখিয়া গম্ভীর মুখে তিনি কহিলেন, "আজ্ গুরি প্রশ্ন! আমার মনে হচ্ছে এ-সম্বন্ধে তোমায় আগেও অনেক কথা আমি বলেছি। ভালবাসা একটা মনোবৃত্তির বিকার,—কল্পনার ক্ষণিক মোহ,—স্নায়ুর উত্তেজনা। এর দৌলতে অর্থাৎ বর্ণনা করে হাজার হাজার টাকা অনায়াসে আমাদের পকেটে এসে তোমাদের লোহার সিন্দুকে বা গহনা-কাপড়ে পরিণত হয়। এ একটা সাময়িক মোহমাত্র। যারা এই ভালবাসার ইতিহাস শোন্‌বার জন্য পাগল, তাদেরও সে একটা সাময়িক মোহের বিকৃত অবস্থার কাল। নদীর জল যেমন তিথি বিশেষে হু হু করে বেড়ে তটের প্রান্ত ডুবিয়ে তট ভেঙে চুরে দিয়ে আবার নদীর বুকেই ফিরে যায়,—এও তেমনি মনোরূপ নদীতে ভালবাসার বান ডাকলেও তা বেশীদিন টিকে থাকে না।" আরো একটা উপমা ঔপন্যাসিকের মনে জাগিয়া উঠিল। চলিতে গিয়া হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িয়া সে কহিল, "সাদা কথায় বোঝাতে গেলে বল্‌তে হয়, যেমন রেশমী কাপড়,

বেনারসী শাড়ী প্রভৃতি রোদে দিলে বা পুরোণো হ'লে তার রং চটে যায়, ভালবাসা ব্যাধিরও রং তেমনি পুরণো হলেই এরও রং চটে যায়। ভাল চিকিৎসক হলে এর চিকিৎসাও জানেন্। আচ্ছা এই ছটা বাজলো, আমি এখন তাহ'লে আসি।" অভ্যস্ত পর্য্যবেক্ষণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্ত্রীর বিষণ্ণ নত-মুখের পানে বারেক চাহিয়া লইয়া বাহিরে যাইবার জন্য দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া মুখ না ফিরাইয়াই আদিত্যনাথ পুনরায় কহিল,—"যে কথাগুলো বল্লাম্, নোট করে রেখ ত! দরকারে লাগ্তে পারে কখন না কখনো।"

এ রকম ফরমাইস্ অণিমাকে অনেক সময়েই খাটিতে হইয়াছে, আজ কিছু নূতন নয়। তবু তাহার দুই চোখ ছাপাইয়া জলের ধারা ঝর্ণার মত ঝরিতে চাহিতেছিল। প্রাণ-পণে নিজের মনকে চোখ রাঙাইয়া অনেক কষ্টেই সে চোখের জল বন্ধ রাখিল। তাহার মনে হইল, তাহার বেণারসীর গোলাপী রং নিঃশেষেই সাদা হইয়া গিয়াছে।

২

জানালার গোলাপী-ছিটের পর্দ্দার রং অন্ধকারে ক্রমেই অস্পষ্ট হইয়া আসিল। চাপা ঝি বাহির হইতে ডাকিয়া কহিল,—"মা, ঘরে আলো জেলে দিই, সন্ধে লেগেছে।" অণিমা তেমনি উদাস নেত্রে শূন্যে চাহিয়া বসিয়া রহিল, উত্তর দিল না।

দ্বারের বাহিরে জুতার শব্দের সহিত পুরুষ কণ্ঠের গম্ভীর স্বর শোনা গেল,—"ঘরে যাব? না, প্রবেশ নিষেধ?" এবং উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়াই প্রশ্নকর্ত্তা সঙ্গে সঙ্গে দ্বার খুলিয়া ঘরে ঢুকিতেই অণিমা ঘোর বিস্ময়ে অস্ফুট চিৎকার করিতে গিয়া, পরক্ষণে আত্মসংবরণ করিয়া লইয়া স্মিতমুখে কাছে আসিয়া মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "কি ভাগ্যি! মনে পড়েছে যে বড়?" আগন্তুক বিনা আতিথ্যেই একখানি কেদারা টানিয়া লইয়া জাঁকিয়া বসিয়া—"মনে মনে গাঁথা সখী—ই—ই—, আমার মন হয়েছে উড়ো পাখী—উড়ো—পা-খী-ই-ই—" সুর ধরিতেই দাসী ঘরে ঢুকিয়া আলো জ্বালিয়া বক্রকটাক্ষে চাহিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেলে, অণিমা হাসিয়া বলিল,—"গান থামান মুখুজ্যে ম'শাই! আপনার মনের খবর জান্তে ত আমার বাকী কিছু নেই। তা'পর ইস্কুল ছেড়ে হঠাৎ যে বড় বাঙ্গলা দেশে?"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় ব্রজেন্দ্রনাথ গম্ভীর মুখে কহিলেন,—হটাৎ আর কই বল? অণু, নিরু কিছুদিন থেকে তোমার দিদির কাছে এম্নি ভার হয়ে উঠেছে যে, সে ভার না নামিয়ে তিনি আর অন্ন-জল গ্রহণ কর্বেন্ না,—এমনি তাঁর কঠিন পণ। অগত্যা ছুটী নিয়ে বারুইপুরে একখানা বাড়ী ভাড়া করে তাইতে আসা গেছে। দেখা যাক্, মেয়ে দু'টোকে বিদেয় কর্বার কি উপায় ক'র্ত্তে পারা যায়। তা'পর তোমাদের খপর বল দেখি। অন্ধকারে একা ঘরে কি হচ্ছিল? কান্না?" "যান—কাঁদতে গেলুম কি দুঃখে?" বলিয়া অণিমা উঠিয়া পর্দ্দা সরাইয়া জান্লাগুলি ভাল করিয়া খুলিয়া বায়ু প্রবেশের পথমুক্ত করিয়া দিল। ব্রজেন্দ্র কহিলেন, "বয়সে দৃষ্টিশক্তি কমে যায় সত্যি,

কিন্তু বিধাতা কাকেও একেবারে বুড়ো করেই সৃষ্টি করেন না—আমারও এককালে বয়স ছিলো রে?" অণিমা কাছে আসিয়া আসন গ্রহণ করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "ছিল নাকি মুখুজ্যে মশাই!—আমি কিন্তু চিরদিনই আপনাকে ঐ একই রকম দেখ্‌ছি।" মুখুজ্যে মহাশয় হাসিমুখে কহিলেন, "তা হ'লে ত' বেঁচে যেতুম্ অণি! চিরদিন একরকম দেখাটাই না কঠিন!—তোমার কথা শুনে তবু আশ্বস্ত হলুম্। সত্যি কথা বল্‌তে কি, তোমায় দেখে আমার ত' ভয়ই হয়েছিল!" "কেন বলুন ত—আমি কি এমনি ভয়ানক দেখ্‌তে?" বলিয়া অণিমা দুষ্টুমির হাসি হাসিয়া সকৌতুকে ব্রজেন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে কথার উত্তর না দিয়া দেওয়ালে টাঙ্গান একখানা বড় এনলার্জ করা ছবীর পানে চাহিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ কহিলেন, "এই বুঝি তোমার সাহেব?" অণিমাকে নীরব দেখিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ উঠিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া অভিনিবেশ সহকারে ছবিখানা দেখিতে লাগিলেন; কোন মতামত প্রকাশ করিলেন না। ছবিদেখা শেষ হইলে তিনি ফিরিয়া কহিলেন, "র‍্যাস্কেলটা না বই লেখে? তোমার দিদিত তাঁর লেখার শতমুখে স্তুতি করে থাকেন্। লোকটা লেখে ভাল তাহলে, নাঃ?" সমালোচক মাসিক পত্রখানির দিকে বক্রকটাক্ষে চাহিয়া অণিমা উদাসীন ভাবে কহিল, "দেখুন না লোকে কি বলে?" ব্রজেন্দ্রনাথ পত্রিকাখানি তুলিয়া পাতা উল্টাইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানটুকু চিহ্নিত করিয়া কহিলেন, "লোকে যা ব'লে তা লোকের মুখেই শোনা যায়। তুমি কি বল, তাই আগে শুনি।" "আমি"—বলিয়া সবেগে কি একটা কথা বলিতে গিয়া তখনি আত্মসংবরণ করিয়া অণিমা কহিল, "পড়ুন্ না!"

পাঠশেষ করিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ শ্যালিকার বিষণ্ণমুখের পানে বক্রকটাক্ষে বারেক চাহিয়া লইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—"বাঃ খাসা ব'লেছে ত'? লোকটা তা হ'লে গোঁয়ার টোঁয়ার নয়,—কেমন? বেশ স্নেহময় হৃদয়বান্ স্বামী! স্ত্রীচরিত্র আঁকবার এ অসাধারণ শক্তি ও যে কোথায় পেলে তাও ত আমার অজানা নয়!—এ শক্তির উৎস যে সেই ছোট বেলার ছোট্ট অণুটী, তা তার মুখুজ্যে মশাই ইন্দোরে বসে ও টের পেয়েছে। সত্যি অণু—তোমার ঘরকন্না দেখে, তোমায় দেখে, বড় সুখী হলুম্। এই চার বচ্ছরে আশ্চর্য্য বদ্‌লে গেছ তুমি! সুন্দরীর সৌন্দর্য্য বাড়ে কি সে বলত;—স্বামীর প্রেমে? আদিত্য যথার্থ ভাগ্যবান্—কারণ তুমি তার স্ত্রী?" "তাতে কি আসে যায়"—বলিয়া অণিমা অন্যদিকে চাহিয়া রহিল। মুখুজ্যে মহাশয় বলিল, "তাতে কি এসে যায়?—আমি বল্‌ছি, খুব এসে যায়, বাজী রাখ্‌তে রাজী আছি।" "মিছে হার্‌বেন,—না মুখুজ্যে মশাই, তাতে আর এখন কিছু আসে না।"—এই কথা অণিমার মুখ হইতে বাহির হইলে ব্রজেন্দ্রনাথ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে শ্যালিকার ভাবব্যঞ্জক মুখের দিকে চাহিয়া সংশয়পূর্ণস্বরে কহিলেন,—"এখন বল্লে যে? কখন ও আস্‌ত তা হ'লে? কথাটা ব্যর্থমূলক হোল কি না? অণিমা আসন ছাড়িয়া উঠিয়া কহিল, "চার বছর বিয়ে হোল,—বুড় হ'য়ে গেলুম,—আবার ও-সব কি? চা খাবেন্?" ব্রজেন্দ্রনাথ গম্ভীর

মুখে কহিলেন,—"তাই ত' অণি, আমারই ভুল। চার-বচ্ছর-তোমাদের বিয়ে হয়ে গেছে! তোমরা ত' এখন তাহ'লে বুড় বুড়ী! আহা তোমায় দিদির মাথায় কবে এমন সুবুদ্ধির উদয় হবে! তিনি ত তোমার চেয়ে আট বচ্ছরের বড় না?—তবু তাঁর বিশ্বাস মুক্তোর চুড়ী আর হিরের ব্রেস্‌লেটে, তাঁকে যেমন মানায়, দুগাছি রাঙা শাঁখা আর কস্তাপেড়ে সাড়ীতে, কিছুতেই তেমন মানাতে পারে না। তুমি, যদি দয়া করে, তাঁর বানপ্রস্থের সময় উপস্থিত, এই সত্যটুকু বুঝিয়ে দিতে পার ভাই,—তাহ'লে অনায়াসেই ব্যাঙ্কের স্মরণ না নিয়ে তাঁর আয়রণচেষ্টের প্রসাদেই কন্যাদায়ে রেহাই পাই। আহা আদিত্য কি ভাগ্যবান্! থিয়েটার, বায়স্কোপে রাত কাটিয়ে এলেও তাকে বোধকরি বাড়ী ঢুকতে দরোয়ানের গলাধাক্কা খেতে বা প্রবেশ নিষেধ শুনতে হয় না।" অণিমা এবার রাগ করিয়া সত্যসত্যই ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে ব্রজেন্দ্রনাথ সহস্ত রাখিয়া কহিলেন, "না—না—বোস। এইবার কাজের কথা! আমি যে তোমায় নিতে এলুম্ তার কি হবে বল দেখি? তোমার দিদি, অবু, নিরু, তেঁতুল সবাই যে তাদের মাসীমার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে! ব'লে এসেছিলুম আজই নিয়ে যাব। তা ত' হোল না, তা হলে! তোমায় বেহারা বল্লে—সাহেবের ফিরতে অনেক রাত্ হবে। তুমি তা হ'লে ঠিক হ'য়ে থেক, কাল দুপুর বেলা এসে তোমায় নিয়ে যাব। তোমার দিদির ইচ্ছে ছুটীটা একটু লম্বা হয়,—অবশ্য উভয় পক্ষের মত থাকলে—" বলিয়া মাটিতে আস্তে আস্তে জুতা ঠুকিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। কুণ্ঠিত অঞ্চলপ্রান্তটী উঠাইয়া লইতে মুখনিচু করিয়া অণিমা কহিল,—"আজই আমায় নিয়ে চলুন মুখুজ্যে ম'শাই—কতদিন দিদিকে দেখিনি, বলুন ত?" "সত্যি অণি, অনেক দিন!—সেও বড় ব্যস্ত হ'য়েছে,—কিন্তু গৃহস্বামীর অনুপস্থিতিতে স্বামিনীকে নিয়ে পলায়ন ঠিক্ আইন-সঙ্গত বা ভদ্রতা-সম্মত হবে না ত! কাল নিশ্চয় আমি নিতে আস্‌বো! সাহেব বাড়ী থাকেন কোন সময়?—অর্থাৎ তাঁর দেখা পাব ঠিক্ কটায় এলে বল ত? মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রশ্নে স্বামীর প্রসঙ্গে অণিমার সুপ্ত অভিমান, রাগ, দুঃখ সমস্তই আবার জাগিয়া উঠিতেছিল। সে বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি কহিল, "আজই কেন নিয়ে চলুন না! কেউ কিচ্ছু বল্‌বে না—দেখবেন্ তখন! গেলেই বা কার ক্ষতি?" ব্রজেন্দ্র ভয়ের অভিনয় করিয়া কহিল,—"সর্ব্বনাশ! অণি সাহসিকে—তুমি কি বৃদ্ধ মুখুজ্যে মশায়কে দিয়ে 'ডুয়েল' লড়াতে চাও? না—না—লক্ষ্মি আজ আর নয়, কাল! কিন্তু ক্ষতিটে কার নেই কেন শুনি? গৃহিণী-হীন গৃহ সে ত অরণ্যের সঙ্গে উপমেয়। গৃহকর্ত্তার বনবাসের ব্যবস্থা দিয়েও বল ক্ষতি নেই!" তাচ্ছীল্যে মাথা হেলাইয়া অণিমা কহিল, "তিনি ত' যাচ্ছেন শৈলাবাসে,—বনবাস ত' আমারই ব্যবস্থা।" ব্রজেন্দ্রনাথ মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "ওঃ, তাই রাগ হয়েছে,—ক'দিন থাকবে সেখানে?" "আমি তার কি জানি? যতদিন ইচ্ছে! মস্তিষ্ক শীতল রাখতে, স্নায়ুকে প্রাণ দিতে মনের শক্তি সঞ্চয় কর্ত্তে প্রাকৃতিক দৃশ্যই হচ্ছে প্রধান ওষুধ। সংসারের ঝঞ্ঝাট্ থেকে মুক্ত থাকা—

সে সময় কত প্রয়োজন আপনি তা হয় ত' অনুমানও কর্ত্তে পার্‌বেন্ না," মুখুজ্যে মহাশয় বলিলেন "না বাবু! তা আমি পার্‌ব্ব না,—তা ঐ সব কর্‌বার সময় তোমার ব্যবস্থা কি রকম হবে?—তোমায় সঙ্গে নিলেই ত' বেশ হ'ত। কল্পনার পেছনে ছুটোছুটী না করে, বাস্তবের ফটো তোলা সে ত আর ও!-" "দয়া করুণ মুখুজ্যে ম'শাই! আপনিও শত্রুতা কর্ব্বেন্ না—তা হ'লে আমি মরে যাব" বলিয়া ফিরিয়া বসায় আধ-অন্ধকারে অণিমার মুখ স্পষ্ট দেখা যাইতে ছিল না,—তবু তাহার কণ্ঠস্বরের আর্দ্র ও আর্ত্তভাব ব্রজেন্দ্রনাথকে বিস্মিত করিয়া দিল। কিছুক্ষণ নীরবেই কাটিয়া গেলে প্রথমে অণিমাই কথা কহিল। কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, "চলুন, আজ আপনাকে আমার রান্না খেতে হবে। আমি নিজে হাতে সব তৈরী করেছি! কেবল কচুরি ক'খানা ভাজ্‌তে বাকী। আপনি বসে থাক্‌বেন্, আমি ভেজে দেবো, সব ঠিক্ করাই আছে, দেরী একটুও হবে না।" (ক্রমশঃ)

শ্রীইন্দিরা দেবী।

গানের স্বরলিপি।

কেদারা—মধ্যমান।

কি সুধা ওই মদির নয়নে;
মন ভৃঙ্গ আকুল লোভে ধায়, তাহারি পানে।
মরতে কি স্বরগে কোথায় আছি জানি নে;
মৃদুল মোহের ঘোর লাগিল অবশ অলস পরাণে॥

কথা ও সুর—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

০ ১ ২ ॥		
II সা -া না -া। ধপক্ষাপা -ধনা -ক্ষাধপা -মগা।	ক্ষপা -ক্ষপা -ধা ক্ষপা।	
কি • সু • ধা • • • • • • • • • •	ও • • • • ই •	
৩ ০ ১		
মা -গা গা মা I মা -ধা ক্ষা -পা।	-গা -মা -রা সা।	
ম • দি র ন • য় •	• • • নে	
২ ৩ ০		
-া সসা সা সমা। -মগা গা পা পা I	পক্ষা -া পা -া।	
• মন ভৃ ঙ্গ • • আ কু ল	লো • • তে •	
১ ২ ৩		
ক্ষপা -ধনা -ক্ষধা -পা। সা না -ধা পধা।	ধনধা -পা -ক্ষপা পা II	
ধা • • • য় তা হা • রি •	পা • • • • রে	

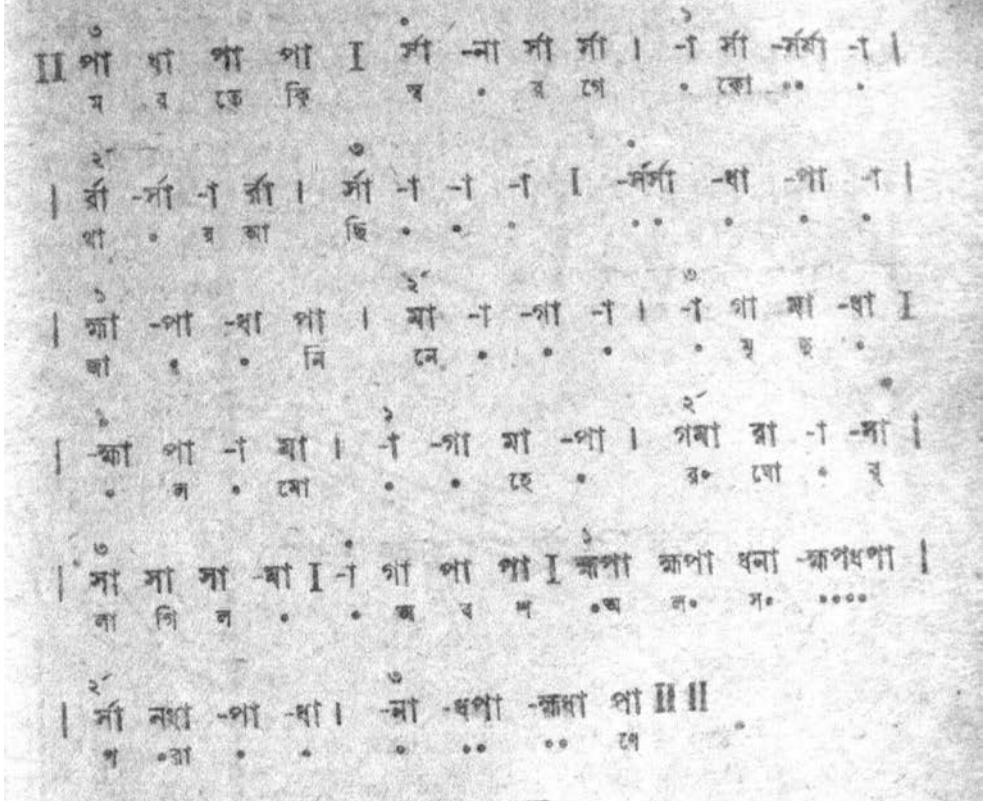

জীবন দান।

সবাই মুখে বলে,
মস্তবড় ওস্তাদ এক গাইবে আজি গান
রাজার সভাতলে,
সন্ধ্যা হ'য়ে এলে,
দেশ-বিদেশের পুরবাসী বালক বৃদ্ধ যুবা
ছুটল দলে দলে
রাজার সভাতলে।
নানা রংয়ের বেশে
সভার মাঝে যেথায় হ'বে ফালোয়াতি গান
জুটল তারা এসে।
পরে সবার শেষে
বিশাল কায় ওস্তাদ মশাই এলে ধীরে ধীরে
সিংহাসনের পাশে
যেথায় রাজা হ'সে।

সন্ধ্যা হ'লে পার
হাত পা ছুড়ে দাড়ি নেড়ে সুরু হ'ল গান
সবে বল্লে বারে বার
"আহা— সুরের কি বাহার
তালমানের জ্ঞানটা এনার রীতিমতই আছে,
তবে গানটা বোঝাই ভার,
গলাবাজিই সার।"
এমন সময় ধীরে
স্নিগ্ধ কান্তি ক্ষুদ্র কেশ একতারাটি হাতে
কেও আসে ঘরে ?
আরে—এ যে পাগ্‌লা হুরে !
সবাই বল্লে ;—'বাঃ আজ তোমায়ে গাইতে
হবে গান
রাজার দরবারে।"

অনেক সাধার পরে
করুণ কণ্ঠে পাগলা হ'য়ে আত্মহারা হ'য়ে
সুরু কর্‌লে গান,
মায়ের মধুর নাম।
স্তব্ধ হ'ল সভা—সজল হ'য়ে উঠল আঁখি
শীতল হ'ল প্রাণ
শুনে হরির গুণ-গান।
আবেগ ভরে রাজা গলা হ'তে মুক্তামালা খুলে
হরিরে করে দান।
হেসে বল্লে হরি;
"কেমনে বল পরি;
গানের রাজা আপনি আজি আছেন যেথা বসি,
মালা সাজে তারি।"
চরণ পরে পড়ি
আশীর্ব্বাদ কর, "যে গান আজি শোনালে তুমি প্রভু
তাহারি সুরে সুরে
পরাণ গেছে ভ'রে।—
শিখেছি যে গান
বুঝিনু আজি মিথ্যা সব—নিরতার প্রতিমূর্ত্তি
কঠিন পাষাণ,
ছিল না তাতে প্রাণ।
মানবের মূর্ত্তি ধ'রে প্রভু, কোন দেবতা তুমি
তা'তে কর্‌লে জীবন দান!"

শ্রীপ্রভবদেব মুখোপাধ্যায়।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

পিতৃবিলাপ কাব্য ও বিবিধ রচনা।—শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ দত্ত প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার দত্ত, আড়ংপাড়া যশোহর। মূল্য ১৲; বাঁধাই ১।০ মাত্র।

গ্রন্থকার পুত্রশোকাতুর প্রবীণ ব্যক্তি। তাঁহার গ্রন্থে সন্নিবেশিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাগুলির মধ্যে এরূপ একটী প্রাণমনোবিমোহিনী করুণস্বরলহরী উত্থিত হইয়াছে যে, তাহার আকর্ষণী শক্তিতে পাঠকমাত্রেরই চিত্ত আকৃষ্ট হয় এবং সহানুভূতিপাশে আবদ্ধ হইয়া স্থানে স্থানে অশ্রু-সংবরণ করা তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। কবিতাগুলির মধ্যে সাক্ষাৎ শোক যেন মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। বিধাতা গ্রন্থকারের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পুত্ররত্নগুলিকে তাঁহার হৃদয়দেশ হইতে উৎপাটিত করিয়া সেস্থানে যে শোকের উৎস উৎসারিত করিয়াছেন, তাহার পূত স্নিগ্ধ বিমল প্রবাহের সৌন্দর্য্যে সকলেই মুগ্ধ ও স্তম্ভিত। এতদ্ব্যতীত পরিশেষে "বিবিধ কবিতা"-নামে যে কয়েকটী কবিতা নিবেশিত হইয়াছে, তন্মধ্যেও ছত্রে ছত্রে কবিত্বের বিকাশ দেখিলে, হৃদয়ে আনন্দ লাভ হয়। শোকে নিপীড়িত গ্রন্থকারের ৮ মাস বয়সের শিশুর শেষদশা দর্শনে লিখিত কবিতাটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল!—

প্রাণধন! মুদিছ নয়ন?
কে আর দেখাবে হায়, ডেকে ডেকে অভাগায়
রবি-শশি-তারকা-গগন!
কে খেলাবে জোনাকীর সনে?
সন্ধ্যার আলোক মাখি, উড়ে যাবে নীড়ে পাখী,
—চেয়ে রবে চকিত নয়নে?
—চুপি চুপি করিবে বরণ,
আসি যবে উষা বালা, শিরে লয়ে স্বর্ণডালা,
ফুলফুল করিবে চয়ন?
কেবা বল খল খল হাসি;
প্রভাতের পানে চেয়ে, সাধা সুরে আধা গেয়ে
পরাজয়ে স্বরগের বাঁশী?
হারা হ'লে সোহাগ চুম্বন,
সুদ্ধ খেলনাগুলি, অলিন্দে মাখিবে ধূলি,
"পুমী" কত করিবে ক্রন্দন!
প্রাণাধিক ফিরাও বদন!
তোতা সম প'ড়ে প'ড়ে ছি ছি ছি ঘুমায়ে পড়ে,
কোন্ শিশু তোমার মতন?
আহা মরে যাই! মরে যাই!!
অই ঢুলু ঢুলু আঁখি, অভাগারে দিলে ফাঁকি
কে শুনাবে "তাই তাই তাই"?

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩২ নং এন্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 667. March, 1919.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৬ বর্ষ। ৬৬৭ সংখ্যা। | ফাল্গুন ১৩২৫। মার্চ্চ, ১৯১৯। | ১১শ কল্প। ৩য় ভাগ।

শারদ-প্রাতে।

(রাগিণী ভৈরোঁ)

যে আলোয় রবি জাগিল প্রভাতে
সেই আলোয় মোরে ছাও,
সুন্দর তুমি হৃদয়নাথ,
হৃদয় পানে মম চাও!
যে আনন্দে পাখী উঠিল গাহিয়া
নবীন আলোকে পুলকে ছাইয়া,
যে আনন্দে তরু খরিল কুসুম,
সে আনন্দ মোরে দাও!

তরু গাহে কলগীতি
মর্ম্মরিয়া বনবীথি,
সঙ্গীত উঠে মুখরিয়া
আকাশে বাতাসে নিতি নিতি।
ওগো হৃদয় আমার ভরিয়া দাও,
পুলকে আলোকে ভাসায়ে যাও,
এস হে নাথ, হৃদয়াসনে,
ভানু-সম চিতে ভাও॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

অষ্টাবক্র গীতা।

ত্রয়োদশ প্রকরণ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অকিঞ্চনভবং স্বাস্থ্যং কৌপীনত্বেঽপি দুর্লভম্।
ত্যাগাদানে বিহায়াস্মাদহমাসে যথাসুখম্॥ ১॥

"আমার কিছুই নাই," এই মহাজ্ঞান হইতে যে সুস্থতা উৎপন্ন হয়, তাহা কৌপীন-ধারী সন্ন্যাসীর পক্ষেও দুর্লভ। অতএব গ্রহণ ও ত্যাগ, উভয়প্রকার আসক্তি হইতে মুক্ত হইয়া আমি যথাসুখে অবস্থান করিতেছি। ১।

কুত্রাপি খেদঃ কায়স্য জিহ্বা কুত্রাপি খিদ্যতে।
মনঃ কুত্রাপি তত্ত্যক্ত্বা পুরুষার্থে স্থিতঃ সুখম্॥ ২॥

যদি ব্রততীর্থাদি সেবন করি, তবে শরীরের ক্লেশ উপস্থিত হয়, যদি স্তোত্রাদি পাঠ করি, তবে বাগিন্দ্রিয়ের ক্লেশ উপস্থিত হয়, যদি ধ্যান-সমাধি করি, তবে মানসিক ক্লেশ হয়; (কিন্তু এই সকলের দ্বারা আমার

কিছু লাভ নাই, কেননা, আমার স্বরূপের তাহাতে কোন উপচয় বা সমৃদ্ধি ঘটিবে না; কিংবা এই সকল ত্যাগ করিলে, কোন ক্ষতিও নাই; কেননা কূটস্থ স্বরূপের হানি অসম্ভব অতএব এই সকল বিষয়ে সচেষ্ট না হইয়া যথাসুখে আত্মস্বরূপে অবস্থান করিতেছি। ২।

কৃতং কিমপি নৈব স্যাদিতি সঞ্চিন্ত্য তত্ত্বতঃ।
যদা যৎ কর্ত্তুমায়াতি তৎ কৃত্বাসে
যথাসুখম্ ॥ ৩ ॥

শরীর, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি যে-সকল কর্ম্মে ব্যাপৃত হয়, তাহাতে আত্মার পরমার্থতঃ কোন প্রকার কর্ত্তৃত্ব বা ভোক্তৃত্ব ঘটে না, ইহা বিচারপূর্ব্বক যখন যাহা কর্ত্তব্যরূপে সমুপস্থিত হয়, তাহাই করিয়া যথাসুখে অবস্থান করিতেছি। (অতীত বা ভবিষ্যতের কোনপ্রকার ভয় বা ভাবনা রাখি না; কেননা, কূটস্থস্বরূপের যখন কোন প্রকার লাভ বা ক্ষতি অসম্ভব, তখন কিসের ভাবনা রাখিবে?)। ৩।

কর্ম্মনৈষ্কর্ম্ম্যনির্বন্ধভাবা দেহস্থযোগিনঃ।
সংযোগাযোগবিরহাদহমাসে যথাসুখম্ ॥ ৪ ॥

"কর্ম্মই কর্ত্তব্য অথবা নৈষ্কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ," এরূপ বিচার দেহাভিমানী যোগীর পক্ষেই হইতে পারে (কেননা, স্বরূপতঃ আত্মা নিষ্ক্রিয়, অতএব ঐ বিচারের তত্ত্বতঃ কোন প্রয়োজনই নাই), কিন্তু আমার দেহের সহিত সংযোগও নাই, বিয়োগও নাই; অতএব আমি যথাসুখে স্বরূপে অবস্থান করি। ৪।

অর্থানর্থৌ ন মে স্থিত্যা গত্যা ন শয়নেন বা।
তিষ্ঠন্ গচ্ছন্ স্বপন্ তস্মাদহমাসে
যথাসুখম্ ॥ ৫ ॥

আমার দাঁড়াইয়া থাকিলে, চলিতে থাকিলে অথবা শয়ন করিয়া থাকিলে, কোন অবস্থাতেই প্রয়োজনও নাই ক্ষতিও নাই; অতএব যখন যে অবস্থা উপস্থিত হয়, দাঁড়ান, চলা বা নিদ্রা, সকল অবস্থাতেই আমি যথাসুখে স্বরূপে অবস্থান করি। ৫।

স্বপতো নাস্তি মে হানিঃ সিদ্ধির্যত্নবতো নবা।
নাশোল্লাসৌ বিহায়াস্মাদহমাসে
যথাসুখম্ ॥ ৬ ॥

নিদ্রা গেলেও আমার কোন ক্ষতি নাই, যত্নবান্ হইলেও আমার কোন লাভ নাই, (কেননা, কূটস্থ চৈতন্যস্বরূপ আমার লাভ, ক্ষতি অসম্ভব। অতএব সকলপ্রকার হর্ষ-শোক ত্যাগ করিয়া আমি যথাসুখে অবস্থান করি। ৬।

সুখাদিরূপানিয়মং ভাবেষ্বালোক্য ভূরিশঃ।
শুভাশুভে বিহায়াস্মাদহমাসে যথাসুখম্ ॥ ৭ ॥

সকল পদার্থেই বহুশঃ সুখদুঃখাদির অনিত্যতা বা অনিয়ম অবলোকন করিয়া শুভ ও অশুভ এই উভয়ই ত্যাগ করতঃ আমি যথাসুখে স্বরূপে অবস্থান করিতেছি।

ইতি অষ্টাবক্র গীতার ত্রয়োদশ প্রকরণ সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ প্রকরণ।

প্রকৃত্যা শূন্যচিত্তো যঃ প্রমাদাদ্ভাবভাবনঃ।
নিদ্রিতো বোধিত ইব ক্ষীণসংসর-ণো হি সঃ
॥ ১ ॥

যিনি স্বভাবতঃ শূন্যচিত্ত, কেবল প্রারব্ধ-কর্ম্মের প্রমাদবশতঃ সাংসারিক বস্তু সকল অবলোকন করেন এবং যাঁহার নিদ্রা ও জাগরণের অবস্থা তুল্যপ্রকার, তাঁহার সংসার-ভোগ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। ১।

ক্ব ধনানি ক্ব মিত্রাণি ক্ব মে বিষয়দস্তবঃ।
ক্ব শাস্ত্রং ক্ব চ বিজ্ঞানং যদামে গলিতা স্পৃহা ॥২॥

যখন সকল বিষয়ে আমার বাসনা আকাঙ্ক্ষা ও তৃষ্ণা সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে, তখন আমার ধন, আমার মিত্র, আমার বিষয়, আমার শাস্ত্র, আমার বিজ্ঞান—এ সকল কোথায়? (রূপরসাদি বিষয়-সকল ইন্দ্রিয়-গণের তেজ ও স্বাস্থ্য হরণ করে, এজন্য তাহারা দস্যুস্বরূপ)। ২।

বিজ্ঞাতে সাক্ষিপুরুষে পরমাত্মনি চেশ্বরে।
নৈরাশ্যে বন্ধমোক্ষে চ ন চিন্তামুক্তয়ে মম ॥৩॥

দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের সাক্ষী (দ্রষ্টা) সর্ব্বশক্তিমান্ পরমাত্মার জ্ঞান হইলে বন্ধন ও মোক্ষ কোন বিষয়েই আশা থাকে না; অতএব মুক্তির জন্য কোনরূপ চিন্তা, ব্যগ্রতা বা ব্যস্ততা, কিছুই থাকে না। ৩।

অন্তর্বিকল্পশূন্যস্য বহিঃ স্বচ্ছন্দচারিণঃ।
ভ্রান্তস্যেব দশাস্তাস্তা স্তাদৃশা এব জানতে ॥৪॥

অন্তরে সকল প্রকার সঙ্কল্প-বিকল্প-পরিশূন্য ও বাহিরে পাগলের ন্যায় যথেচ্ছ আচরণকারী মহাজ্ঞানীর সেই সেই অবস্থা তদ্রূপ ব্যক্তিরাই জানেন। অন্যে সেই সেই অবস্থার অনির্বচনীয় পরমানন্দের লেশ কল্পনাও করিতে পারে না।

ইতি অষ্টাবক্রগীতার শান্তিচতুষ্কনামক চতুর্দ্দশ প্রকরণ সমাপ্ত।

পঞ্চদশ প্রকরণ।

যথাতথোপদেশেন কৃতার্থঃ সত্ত্ববুদ্ধিমান্।
আজীবমপি জিজ্ঞাসুঃ পরস্তত্র বিমুহ্যতি ॥১॥

যাহার সাত্ত্বিকী বুদ্ধি, সে যথাকথঞ্চিৎ উপদেশ পাইলেই আত্মজ্ঞানলাভ করতঃ কৃতার্থ হয়, কিন্তু অন্যে (যাহাদের বুদ্ধি রাজসিকী অথবা তামসিকী) তাহাদিগকে মরণ পর্য্যন্ত উপদেশ করিলেও তাহাদিগের আত্মস্বরূপের জ্ঞান জন্মে না, পরন্তু সে-বিষয়ে অনেক সময় তাহারা বিপরীত-বুদ্ধিযুক্ত হয়। ১।

মোক্ষো বিষয়বৈরস্যং বন্ধো বৈষয়িকো রসঃ।
এতাবদেব বিজ্ঞানং যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥২॥

বিষয়-সম্বন্ধে আসক্তি না করাই-ও বিষয়-মোক্ষ সম্বন্ধে আসক্তি থাকাই বন্ধন। ইহাই সর্ব্ব বেদান্ত-বিজ্ঞানের সার। এখন তোমার যাহাতে রুচি তাহাই কর। ২।

বাগ্মিপ্রাজ্ঞমহোদ্যোগং জনং মূকজড়ালসম্।
করোতি তত্ত্ববোধোঽয়মতস্ত্যক্তো বুভুক্ষুভিঃ ॥৩॥

সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান মহাবাগ্মীকে মূক করে, মহাপণ্ডিতকে জড়বুদ্ধিসম্পন্ন করেও মহোদ্যোগশালী পুরুষকে অলস করে। অতএব ভোগবাসনাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় ইচ্ছা করেন্ না। অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানী বিষয়-ভোগ-সম্বন্ধে মূক, জড় ও অলস হন্। ৩।

ন ত্বং দেহো ন তে দেহো ভোক্তা কর্ত্তা ন
বা ভবান্।
চিদ্রূপোঽসি সদাসাক্ষী নিরপেক্ষঃ সুখং চর ॥৪॥

(হে শিষ্য,) তুমি দেহরূপ নহ, কিম্বা দেহও তোমার নহে, তুমি চিন্মাত্র; অতএব তুমি কর্ম্মফলের ভোক্তাও নহ, কর্ম্মকর্ত্তাও নহ, তুমি কেবল সর্ব্বদা সকল বস্তুর দ্রষ্টৃরূপে বর্ত্তমান আছ। অতএব স্ত্রী, পুত্র, বিত্ত প্রভৃতি সকল বিষয়ে নিরপেক্ষ হইয়া সুখে বিচরণ কর। ৪।

রাগদ্বেষৌ মনোধর্ম্মৌ ন মনস্তে কদাচন।
নির্ব্বিকল্পোঽসি বোধাত্মা নির্ব্বিকারঃ সুখং চর ॥৫॥

(হে শিষ্য,) রাগ ও দ্বেষ মনেরই ধর্ম, তোমার নহে; এবং মনের সহিত তোমার কদাপি কোন প্রকার বাস্তব সম্বন্ধ নাই; তুমি সর্ব্বপ্রকার-সঙ্কল্প-বিকল্প-রহিত জ্ঞান স্বরূপ, অতএব তুমি রাগাদিবিকার-রহিত হইয়া সুখে বিচরণ কর ।৫।

সর্বভূতেষু চাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
বিজ্ঞায় নিরহঙ্কারো নির্মমস্ত্বং সুখী ভব ॥ ৬ ॥

আত্মা সকল প্রাণীতে অবস্থিত ও সকল প্রাণী আত্মায় অধ্যস্ত—ইহা জানিয়া অহঙ্কার ও মমতা ত্যাগ করিয়া সুখী হও। ৬।

বিশ্বং স্ফুরতি যত্রেদং তরঙ্গা ইব সাগরে।
তত্ত্বমেব ন সন্দেহশ্চিন্মূর্ত্তে বিজ্বরো ভব ॥ ৭ ॥

সাগরে যেরূপ তরঙ্গ উত্থিত হয়, সেইরূপ যাহাতে এই বিশ্বের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় হয়, তাহা তুমিই—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতএব হে চৈতন্যস্বরূপ শিষ্য, সর্বপ্রকার সন্তাপরহিত হও। ৭।

শ্রদ্ধস্ব তাত শ্রদ্ধস্ব নাত্র মোহং কুরুষ্ব ভোঃ।
জ্ঞানস্বরূপো ভগবানাত্মা ত্বং প্রকৃতেঃ পরঃ ॥৮॥

হে তাত, তুমি প্রকৃতির অতীত জ্ঞানস্বরূপ সর্বশক্তিমান্ আত্মা—এবিষয়ে দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন কর, কোনরূপ সংশয় বা বিপরীতবুদ্ধি করিও না। ৮।

গুণৈঃ সংবেষ্টিতো দেহস্তিষ্ঠত্যায়াতি যাতি চ।
আত্মা ন গন্তা নাগন্তা কিমেনমনুশোচসি ॥৯॥

ত্রিগুণ হইতে উৎপন্ন চতুর্বিংশতি-তত্ত্ব-সংবলিত দেহই সংসারে অবস্থান করে, উৎপন্ন হয় বা নষ্ট হয়; (আত্মা নিত্য ও সর্বব্যাপী), ইহা সংসারে আসেও না যায়ও না; অতএব (দেহের মৃত্যু, জন্ম প্রভৃতি ধর্ম ইহাতে আরোপ করিয়া) কেন শোকগ্রস্ত হও? ।৯।

দেহস্তিষ্ঠতু কল্পান্তং গচ্ছত্বদ্যৈব বা পুনঃ।
ক্ব বৃদ্ধিঃ ক্ব চ বা হানিস্তব চিন্মাত্ররূপিণঃ ॥১০॥

দেহ কল্পান্ত পর্য্যন্ত থাকুক্, অথবা অদ্যই নষ্ট হউক, (হে শিষ্য) ইহাতে তোমার ক্ষতি, বৃদ্ধি, কিছুই নাই; কেননা তুমি নিত্যচৈতন্য-স্বরূপ ।১০।

ত্বয্যনন্তমহাম্ভোধৌ বিশ্ববীচিঃ স্বভাবতঃ।
উদেতু বাস্তমায়াতু ন তে বৃদ্ধির্ন বা ক্ষতিঃ ॥ ১১ ॥

হে শিষ্য, তুমি অনন্ত-চৈতন্যসাগরস্বরূপ; ইহাতে বিশ্বরূপ তরঙ্গ স্বভাবতঃ উদিত হউক্ বা আস্তমিত হউক, তাহাতে (নিত্যচৈতন্য-স্বরূপ) তোমার লাভালাভ কিছুই নাই ।১১।

তাত চিন্মাত্ররূপোঽসি ন তে ভিন্নমিদং জগৎ।
অতঃ কস্য কথং কুত্র হেয়োপাদেয়কল্পনা ॥১২॥

হে তাত, তুমি এক অখণ্ড চৈতন্য-স্বরূপ, জগৎ তোমা হইতে ভিন্ন অতিরিক্ত কিছুই নহে। অতএব কে, কি-জন্য, কোথায়, কি গ্রহণ বা ত্যাগ করার কল্পনা করিবে? ।১২।

একস্মিন্নব্যয়ে শান্তে চিদাকাশেঽমলে ত্বয়ি।
কুতো জন্ম কুতোঃ কর্ম কুতোঽহঙ্কার এব চ॥১৩॥

হে শিষ্য, এক অখণ্ড শান্ত নির্মল চিদাকাশস্বরূপ তোমার জন্মই বা কোথা হইতে হইবে? কর্মই বা কি করিয়া সম্ভব, অহঙ্কারই বা কোথা হইতে আসিবে? ।১৩।

যত্ত্বং পশ্যসি তত্রৈকস্ত্বমেব প্রতিভাসসে।
কিং পৃথক্‌ভাসতে স্বর্ণাৎ কটকাঙ্গদনূপুরম্ ॥১৪॥

যেরূপ বলয়, বাজু, নূপুর প্রভৃতি স্বর্ণাভরণ-সমূহ স্বর্ণ হইতে অতিরিক্ত কিছুই নহে, তদ্রূপ তুমি যাহা কিছু দেখিতেছ, তাহাতে তুমিই প্রতিভাত হইতেছ, ঐ সকল তোমা হইতে অতিরিক্ত কিছুই নহে।

অয়ং সোঽহময়ং নাহং বিভাগমিতি সন্ত্যজ।
সর্ব্বমাত্মেতি নিশ্চিত্য নিঃসঙ্কল্পঃ সুখী ভব ॥১৫॥

'ইহা আমি', 'ইহা আমি নয়'—এইরূপ বিভাগ বা ভেদ ত্যাগ কর। সমস্তই আত্মা, এইরূপ স্থির করিয়া সকলপ্রকার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া সুখী হও।১৫।

তবৈবাজ্ঞানতো বিশ্বং ত্বমেকঃ পরমার্থতঃ।
ত্বত্তোঽন্যো নাস্তি সংসারী নাসংসারী চ কশ্চন ॥১৬॥

হে শিষ্য, তোমারই অজ্ঞানবশতঃ এই বিশ্ব প্রতিভাত হইতেছে, পরমার্থতঃ তুমিই একমাত্র আছ। তোমা-ব্যতিরিক্ত সংসারী অথবা অসংসারী আর কেহই নাই।১৬।

ভ্রান্তিমাত্রমিদং বিশ্বং ন কিঞ্চিদিতি নিশ্চয়ী।
নির্বাসনঃস্ফূর্ত্তিমাত্রো ন কিঞ্চিদিব শাম্যতি॥১৭॥

এই জগৎ ভ্রান্তিমাত্র, বাস্তবিক কিছুই নহে—এইরূপ স্থির নিশ্চয় যাহার হইয়াছে, তিনি সকলপ্রকার বাসনারহিত ও প্রকাশ-স্বরূপ হইয়া কেবল চৈতন্যস্বরূপে শান্ত হন।১৭।

একএব ভবাম্ভোধাবাসীদস্তি ভবিষ্যতি।
ন তে বন্ধোঽস্তি মোক্ষো বা কৃতকৃত্যঃ সুখংচর ॥১৮॥

এই ভবনহার্ণবে একমাত্র তুমিই ছিলে, আছ ও থাকিবে; অতএব তোমার বাস্তবিক বন্ধনও নাই, মোক্ষও নাই—এই জ্ঞানলাভ-পূর্ব্বক কৃতার্থ হইয়া সুখে বিচরণ কর।১৮।

মা সঙ্কল্পবিকল্পাভ্যাং চিত্তং ক্ষোভয় চিন্ময়।
উপশাম্য সুখং তিষ্ঠ স্বাত্মানন্দবিগ্রহে ॥১৯॥

হে চৈতন্যস্বরূপ শিষ্য, সঙ্কল্প ও বিকল্পের দ্বারা চিত্তকে চঞ্চল করিও না, সঙ্কল্প-বিকল্প শান্ত করিয়া, আনন্দবিগ্রহ নিজাত্মায় সুখে থাক ॥ ১৯ ॥

ত্যজৈব ধ্যানং সর্ব্বত্র মা কিঞ্চিদ্ধৃদি ধারয়।
আত্মা ত্বং মুক্তএবাসি কিং বিমৃশ্য করিষ্যসি ॥২০॥

হে শিষ্য, সর্ব্বত্র ধ্যান ত্যাগ কর, কোন প্রকার সঙ্কল্প-বিকল্প হৃদয়ে ধারণ করিও না; কারণ, আত্মস্বরূপ তুমি ত সর্ব্বদা মুক্তই আছ, পুনরায় ধ্যান-ধারণা-দ্বারা আর অধিক কি লাভ করিবে?

ইতি অষ্টাবক্রগীতার তত্ত্বোপদেশ-নামক পঞ্চদশ প্রকরণ সমাপ্ত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীধীরেশচন্দ্র শাস্ত্রী।

হিন্দুর তীর্থনিচয়।

বরুণাসঙ্গম হিন্দুর পক্ষে অতি পবিত্র স্থান। এখানে গঙ্গা ও বরুণা উভয়ে মিলিত হইয়াছেন। এখানে যে সকল মন্দির দেখা যায় তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎটীর নাম আদিকেশব। আদিকেশব অন্য কেহ নহেন—স্বয়ং বিষ্ণু। মন্দিরটী প্রস্তর নির্ম্মিত ও শিখরদার। আদি কেশবের বর্ণটী শ্যাম এবং ইনি চতুর্ভুজ। মূর্ত্তিটী দেখিবার যোগ্য বটে। বিগ্রহটী উচ্চে

দুই হাত। চারিটী হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম আছে; এগুলি রৌপ্যের। মূর্ত্তির দুই পার্শ্বে জয় বিজয় নামে দুইটী পারিষদের প্রতিমা আছে। আদিকেশবের মন্দিরের উত্তরে একটী প্রাচীন ও জীর্ণ ধর্ম্মশালায় বামনজীর শিখরদার মন্দির অবস্থিত। শুনা যায় যে ইং ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের সময় আদিকেশবের মন্দির বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু পাঁচ বৎসর পরে ১৮৬৩ সালে উহা পুনরায় খোলা হয়। স্কন্দপুরাণে লেখা আছে যে মাঘ শুক্ল সপ্তমীর দিনে আদি কেশবের পূজা করিলে সাত জন্মের পাপ মুক্ত হয়। আদি কেশবের মন্দিরের অভ্যন্তরে সূর্য্যের মূর্ত্তি আছে। মন্দিরের ছাদটী ১০টী স্তম্ভের উপর স্থাপিত। ইহার নিম্নে অনেকগুলি বিগ্রহ আছে, তন্মধ্যে সঙ্গমেশ্বর এবং ব্রহ্মেশ্বরের নাম উল্লেখ যোগ্য; প্রথমটী শিবলিঙ্গ এবং দ্বিতীয়টী চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার। এখানে বিষ্ণুর পাদপদ্মও আছে। মণিকর্ণিকা ঘাটেও অনুরূপ পাদপদ্ম দেখা যায়।

বরুণা সঙ্গম ঘাটের উপর পুরাতন ভগ্নদুর্গের নিদর্শন আছে। ইহার কিছু দূরে লালখাঁ নামক জনৈক মুসলমানের একটি বৃহৎ গোর দৃষ্ট হয়।

রাজঘাটের সেতুটী দেখিতে অতি সুন্দর। লোক জন, মাল পত্র ইহার উপর দিয়া গমন করে। ইহার দক্ষিণে কিছুদূরে প্রহ্লাদ ঘাট। ইহার প্রায় দেড় ক্রোশ দূরে "কপিল মোচন" নামে একটি পুষ্করিণী আছে। ইহাকে কেহ কেহ ভৈরবকা তালাও ও কহিয়া থাকে। পুষ্করিণীর উত্তরে একটি স্তম্ভ আছে। ইহা উচ্চে ৮ ফিট ও স্থৌল্যে ৩ ফিট। ইহা লাট নামে খ্যাত। এই লাট লইয়া হিন্দু মুসলমানে একটি ভয়ানক হাঙ্গামা হয়। ঘটনাক্রমে হিন্দুর হোলী ও মুসলমানের মহরম একই দিনে পড়ে। দুই দলই এক রাস্তায় আপন আপন ধর্ম্ম সঙ্ঘ লইয়া যাইতেছিল। উভয়ে সম্মুখিন হইলে কেহ কাহাকেও পথ দিল না। ফলে হাঙ্গামা ঘটিল। মুসলমানেরা লাট ভাঙ্গিয়া ফেলিল। হিন্দুরা মুসলমানদিগের মসজিদ ধ্বংস করিল। মুসলমানগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। ইংরাজ সরকারের হস্তক্ষেপে শান্তি স্থাপনা হইল নতুবা ব্যাপার বড়ই ভয়ঙ্কর হইত।

* * * *

শিবালা ঘাটটী রাজা চেত সিংহের অধঃপতনের সহিত সম্বন্ধীভূত। কাশীতে সর্ব্বশুদ্ধ ৫১টী ঘাট আছে। নিম্নে তালিকা দেওয়া গেল:—

১ বরুণা সঙ্গম ঘাট	৮ লাল ঘাট	১৫ লক্ষণবালা ঘাট
২ রাজঘাট	৯ শীতলা ঘাট	১৬ রাম ঘাট
৩ প্রহ্লাদ ঘাট	১০ রাজ[illegible]র ঘাট	১৭ অগ্নীশ্বর ঘাট
৪ নরা ঘাট	১১ ব্রহ্ম[illegible]ট	১৮ ভোঁসলা ঘাট
৫ ত্রিলোচন ঘাট	১২ দুর্গ[illegible]বাট	১৯ গঙ্গামহল ঘাট
৬ মহমা ঘাট	১৩ প[illegible]গঙ্গা ঘাট	২০ সঙ্কটা ঘাট
৭ গায় ঘাট	১৪ মাধবরাম ঘাট	২১ সোঁমিয়া ঘাট

২২ মণিকর্ণিকা ঘাট
২৩ চিতা ঘাট
২৪ রাজরাজেশ্বরী ঘাট
২৫ ললিতা ঘাট
২৬ মীর ঘাট
২৭ মানমন্দির ঘাট
২৮ দশাশ্বমেধ ঘাট
২৯ অহল্যা বাঈ ঘাট
৩০ রাণামহল ঘাট
৩১ চৌসট্ ঘাট
৩২ পাণ্ডে ঘাট
৩৩ মুন্সী ঘাট
৩৪ সর্ব্বেশ্বর ঘাট
৩৫ রাজা ঘাট
৩৬ নারদ ঘাট
৩৭ মানসরোবর ঘাট
৩৮ সোমেশ্বর ঘাট
৩৯ চৌকী ঘাট
৪০ কেদার ঘাট
৪১ লঙ্গী ঘাট
৪২ শ্মশান ঘাট
৪৩ হনুমান ঘাট
৪৪ দণ্ডী ঘাট
৪৫ শিবালা ঘাট
৪৬ বুন্দরাজ ঘাট
৪৭ জানকী ঘাট
৪৮ তুলসী ঘাট
৪৯ বাজীরাও ঘাট
৫০ রালামিশ্র ঘাট
৫১ অসিসঙ্গম ঘাট

বারাণসী ধামে যে সকল মেলা হইয়া থাকে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে :— পঞ্চগঙ্গা মেলা কার্ত্তিক মাসে, চৈত্রমাসে দুর্গাকুণ্ডে নবরাত্রী মেলা, ৩রা চৈত্র রাজমন্দির ঘাটে গৌ গৌর মেলা, চৈত্রমাসে রামঘাটে রাম নবমী মেলা, বৈশাখ মাসে বড়াগণেশ মহল্লায় নরসিংহ চতুর্দ্দশীর মেলা, গঙ্গাতটে গঙ্গা সপ্তমীর মেলা, জ্যৈষ্ঠমাসে শুক্লপক্ষীয় দশমীতে দশহরা মেলা, ১১ই জ্যৈষ্ঠ অসিঘাটে জগন্নাথের মন্দিরে স্নান যাত্রীর মেলা, আষাঢ় মাসে পণ্ডিত বেণীরামের উদ্যানে রথযাত্রার মেলা, ১৫ই আষাঢ়ে চৌকাঘাটে বাতাস পরীক্ষার মেলা, শঙ্কুধারা পুষ্করিণী তটে (দ্বারিকা তীর্থে) শঙ্কুধর মেলা, শ্রাবণ মাসে প্রতি রবিবারে বৃদ্ধকাল মহল্লায় বৃদ্ধকাল মেলা, শ্রাবণ মাসে প্রতি মঙ্গলবারে দুর্গাকুণ্ডে দুর্গা মেলা, শ্রাবণ মাসের ১৫ই নাগকুয়ায় নাগ পঞ্চমীর মেলা, ভাদ্রমাসে ঈশ্বরগাদী এবং শঙ্কুধারায় কজরি মেলা, ভাদ্রমাসের ৪টা বড়াগণেশের মন্দিরে ঢেলা চৌথ মেলা, ভাদ্রমাসে ৬ই অসি সঙ্গমের নিকট লোহারিক কুণ্ডে লোহারিক চৌথ মেলা ভাদ্র মাসের ১২ই বরুণা সঙ্গম এবং চিত্রকোটে বামন দ্বাদশীর মেলা, ১৪ই ভাদ্র রামনগরে অনন্ত চতুর্দ্দশীর মেলা, ভাদ্র হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত লক্ষ্মীকুণ্ডে সূর্য্য মেলা, কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত চিত্রকোটে রামলীলা, আশ্বিনমাসে দুর্গা মেলা, কার্ত্তিক মাসে থাথেরী বাজার এবং চৌখাম্বাতে ধনেতেরস মেলা, কার্ত্তিক মাসে ভাদাইনি মহল্লায় মীরঘাটে অনর্ক চতুর্দ্দশ মেলা, ১৫ই কার্ত্তিক দেওয়ালী (দীপমালিকা), কার্ত্তিক মাসে যমঘটে যমাদীত্য (ভ্রাতৃদ্বিতীয়া) মেলা, কার্ত্তিক মাসে পঞ্চগঙ্গা ঘাটে কার্ত্তিক পূর্ণিমার মেলা, অগ্রহায়ণ মাসে চৌকাঘাটে এবং শিবপুরে বরুণাপিয়াল মেলা, অগ্রহায়ণ মাসে শিবপুরে পঞ্চকুশী মেলা, অগ্রহায়ণ মাসে পিশাচ মোচনে লোটা ভাঁটা মেলা, অগ্রহায়ণ মাসে চৌকাঘাটে নগর প্রদক্ষিণ মেলা, মাঘ মাসে বড়া গণেশে গণেশ চৌথ মেলা, মাঘ মাসে রামনগরে বেদব্যাস মেলা, ফাল্গুন মাসে বিশ্বেশ্বর এবং বাইজনাথে

শিবরাত্রী মেলা, ফাল্গুনমাসে হোলী, চৈত্র মাসে দশাশ্বমেধ ঘাটে ধরন্তি মেলা, হোলীর পর মঙ্গলবারে গঙ্গাতটে বুড়্হামঙ্গলের মেলা, বুড়্হামঙ্গলের পর জগন্নাথ মন্দিরে জঙ্গল মেলা হইয়া থাকে।

যাঁহারা কাশীতে আসেন তাঁহারা যেন একবার সারনাথ দর্শন করেন। সারনাথে বৌদ্ধদিগের এককালে কীর্ত্তি ছিল। যদিও এখন তাহা লোপ পাইয়াছে তথাপি বিহার, স্তূপ, হরিণ বন, দেখা যায়। এখানে বৌদ্ধদিগের উত্তমোত্তম স্থপতির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। সারনাথের চৈত্যটী দেখিবার বস্তু।

হাবেলী পরগণার ফয়জাবাদ তহসিলভুক্ত অযোধ্যা একটি সহর। ইহা ঘর্ঘরা উপকূলে অবস্থিত। ঘর্ঘরার অন্য একটি নাম সরযূ। অযোধ্যাঘাটের সেতু দ্বারা নদীর পরপারে যাইতে হয়। অযোধ্যার জনসংখ্যা ২১৫৮৪। সহরটীতে একটি মধ্যবৃত্তি স্কুল, দশটী সংস্কৃত পাঠশালা এবং একটী হাঁসপাতাল আছে। শেষোক্তটী রসুলপুরের রায় শ্রীরাম বাহাদুর নির্ম্মাণ করিয়া দেন। পাঠশালাগুলি মন্দির দ্বারা পরিচালিত।

অযোধ্যা বহু পুরাতন সহর। সপ্তপুরীর মধ্যে অযোধ্যাই প্রথম। সূর্য্যবংশাবতংশ রামচন্দ্রের ইহা জন্মস্থান। এইখানেই তাঁহার রাজ্যাভিষেক হয়। রামচন্দ্রের ইতিহাস সকলেই জানেন; তথাপি সংক্ষেপে কিছু বলা আবশ্যক। আজ রাজার মৃত্যুতে তৎপুত্র দশরথ রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী অযোধ্যার সিংহাসনারূঢ় হইয়া সাম্রাজ্যভার গ্রহণ করেন। মন্বোক্ত দশবিধ ধর্ম্মই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছিল। কোনমতে ধর্ম্মপদবী হইতে তিনি স্খলিতপদ হন নাই। শৌর্য্যবীর্য্য ও গাম্ভীর্য্যগুণে তিনি অতি মাননীয় ছিলেন। তিনি বাহুবলে সকল রাজাকেই জয় করিয়া সমুদ্রমেখলা ধরণীপৃষ্ঠে সর্ব্বত্রেই তাঁহার জয়পতাকা উড্ডীয়মান করিয়াছিলেন। তিনি কুলজন হিতকারী ও বন্ধুবর্গানুমোদী হইয়া রাজ্য করেন। কেবল দৈবদুর্বিপাক বশতঃ অনপত্যতা দুঃখেই চিরদিন তাঁহার চিত্ত সন্তাপিত ছিল। মহারাজা দশরথ অনেকগুলি রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা কোশল রাজকন্যা কৌশল্যা, মধ্যমা কেকয়দেশীয় গিরিব্রজ রাজধানীর অধিপতি কেকয়রাজদুহিতা কৈকেয়ী, আর সুমিত্র দ্বিপীয় রাজকন্যা সুমিত্রা, এই তিন মহিষীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। এতদ্ভিন্ন সিংহল, তারকট, মরীচি, বাহ্লব, তাম্রবর্ণ, নাগদ্বীপ এবং ইন্দুদ্বীপীয় অনেকানেক রাজকন্যাকে তিনি বিবাহ করেন। কিন্তু কোন গর্ভেই সন্তান জন্মে নাই—কেবল শান্তা নামে এক কন্যামাত্র হইয়াছিল। সেই কন্যাকে প্রতিপালন করিতে প্রিয়সখা অঙ্গদেশীয় রোমপাদ রাজাকে প্রদান করেন। বিভাণ্ডক ঋষিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গের সহিত শান্তার পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হয়। সেই ঋষ্যশৃঙ্গ দশরথ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদন করেন। অনন্তর প্রবীনা তিন রাজ্ঞী পুত্রীয় চরু ভক্ষণ করিয়া কালে গর্ভধারণ করেন। ঐ তিন মহীষীর গর্ভে চারিটী সন্তান হয়। কৌশল্যা গর্ভে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠগুণশালী শ্রীরাম, মধ্যমা গর্ভে ভরত, কনিষ্ঠা গর্ভে সর্ব্বগুণান্বিত লক্ষণ ও শত্রুঘ্নের উৎপত্তি হয়। লক্ষণ শ্রীরামানুগত,

শত্রুঘ্ন ভরতানুগত হয়েন। এই চারিপুত্রের অদ্ভুত চরিত্রগুণে, আর ভবিষ্যদ্বক্তা মহর্ষি বাল্মীকি রাম জন্মের পূর্ব্বে রামায়ণগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, সেই সকল প্রত্যক্ষ হওয়াতে সকল লোকেই তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন।

ইক্ষ্বাকুবংশীয় মিথি নামক রাজা মিথিলা নামে এক নগর স্থাপন করেন। আধুনিক ইহার নাম ত্রিহুত। এই মিথিলা নগরে সেই সময়ে সীরধ্বজ জনক নামে এক মহা-সম্ভ্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি মহাযোগী, যোগ-প্রভাবে রাজর্ষিকল্পে পরিগণিত হইয়াছিলেন। ঐ জনক যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিবার কালে মৃত্তিকা হইতে এক কন্যারত্ন লাভ করেন। তাঁহার নাম সীতা, তদ্ভিন্ন জনকের আরও কন্যাত্রয় ছিল। শ্রীরামচন্দ্র সেই সীতার পাণি গ্রহণ করেন এবং শ্রুতকীর্ত্তি, উর্ম্মিলা প্রভৃতি আর তিন কন্যার সহিত ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের বিবাহ হয়।

অনন্তর মহারাজা দশরথ শ্রীরামচন্দ্রকে রাজ্যে অভিষেক করিবার কালে তৎপ্রিয়তমা পত্নী ভরত জননী কৈকেয়ী স্বীয় পুত্র ভরতকে রাজ্য দিবারকারণ অনুরোধ করেন। তাহার কারণ রাজা কৈকেয়ীকে বরদ্বয় প্রদান করিব বলিয়া পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। সেই বর যাচিঞা ছলে কৈকেয়ী এক বরে শ্রীরামের বনবাস ও দ্বিতীয় বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক প্রার্থনা করেন। তন্নিমিত্ত রাজসভায় মহা বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু ভরত তৎকালে মাতামহাশ্রয়ে অধিবাস করিতেছিলেন। মহাধার্ম্মিক শ্রীরামচন্দ্র তৎকালে এই বিবেচনা করিলেন, যে পিতা মহারাজ ধার্ম্মিক সত্যপরায়ণ, তাঁহাকে সত্য বিচলিত করা আমার কোন মতেই শ্রেয়স্কর নহে, এবং সর্ব্বাভিমত-সিদ্ধ না হইলেও রাজ্যে সুখলাভ হইতে পারে না, একারণ শ্রীরামচন্দ্র সর্ব্বসন্তোষার্থে আপনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চীরবল্কল জটাধারণ পূর্ব্বক সীতাসহ দণ্ডকারণ্যে গমন করেন, ভ্রাতৃ স্নেহানুসারে ধনুর্দ্ধর লক্ষ্মণ ও তৎসমভিব্যাহারী হন। পরে পুত্রশোকাভিসন্তপ্ত রাজা দশরথ সুতীব্র যাতনা সহ করিতে না পারিয়া কেবল রামানুস্মরণ করতঃ দিনত্রয় মধ্যেই নশ্বর পাঞ্চ-ভৌতিক দেহ ত্যাগ করিয়া সুরলোকে গমন করেন। তৎসংবাদ শ্রবণে অতিব্যাকুল হইয়া মাতামহালয় হইতে ভরত সত্বর গমনে অযোধ্যায় আগমন করেন। আগত হইয়া রাজার মৃতদেহ দেখিয়া এবং প্রিয়তর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাম নির্ব্বাসন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত মনে মাতাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিয়া রামানয়নে দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করেন। পথিগত চিত্রকূটে শ্রীরামের দর্শন প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে অনেক বিনয় সহকারে আনিতে যত্ন করিলেন, কিন্তু রাম কর্ত্তৃক তাঁহার তচ্চেষ্টা সফল হইল না। অনন্তর ভরত শ্রীরামচন্দ্রের কুশপাদুকা লইয়া অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হন। সেই পাদুকা দ্বয়কে রাজসিংহাসনে সংস্থাপন করতঃ আপনি জটাবল্কল ধারণ পূর্ব্বক নন্দীগ্রামে বাস করিয়া মন্ত্রীরূপে রাজকার্য্য করিয়াছিলেন।

অনন্তর শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, সীতা সমভিব্যাহারে দণ্ডকারণ্য মধ্যে স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ঐ বনে বিরাধ নামক এক রাক্ষস চমূপতিকে বিনাশ করিয়া একাম্রকাননে

অগস্ত্যাশ্রমে উপস্থিত হন। অতি প্রীতমনা হইয়া মুনিবর শ্রীরাম লক্ষণকে দুইখানি অজেয় ধনু ও দুইটি অক্ষয় শায়কতূণ প্রদান করেন। তথা হইতে গমনকালে তাঁহারা কবন্ধ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। পরে কবন্ধকে নিহত করিয়া গোদাবরী তীরে পঞ্চবটী মধ্যে উটজ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাসকরতঃ অনেক সময়কে সমতিপাত করেন। অধুনা তৎস্থানের নাম পুণা-সেতারা হইয়াছে।

একদা দশানন ভগিনী সূর্পণখা ঐ আশ্রম-গতা হইয়া শ্রীরামলক্ষণ রূপসন্দর্শনে স্মর শরে উন্মথিত চিত্তা হয়। হৃদয়াগ্নিতাপে সন্তপ্তা নিশাচরী অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য ধারণপূর্ব্বক উৎপন্ন স্মররোগপশান্তি নিমিত্তক মহৌষধি জ্ঞানে রামলক্ষণ সন্নিধানে আসিয়া স্বীয়াভিলাষ প্রকাশ করিয়া কহে, তৎশ্রবণে জাতামর্ষা হইয়া রামেঙ্গিতানুসারে ধনুর্দ্ধর লক্ষণ শাণিত ক্ষুর প্রেষণ দ্বারা তাহার নাসাকর্ণ ছেদন করেন। তাহাতে সূর্পণখা সত্বরগমনে আসিয়া তৎপরিত্রানদ খর, দূষণ ও ত্রিশিরাদি পুরুষত্রয়কে সংবাদ করে। তৎসংবাদ শ্রবণে কূটযোধী নিশারত্রয় সন্নদ্ধ হইয়া রামনিগ্রহার্থে পঞ্চবটীতে সমাগত হয়। রঘুনাথ তদ্দৃষ্টে জানকীর রক্ষার্থে অনুজ লক্ষণকে সংস্থাপন করতঃ ধনুষ্পাণি হইয়া তাহাদিগের সম্মুখে সংগ্রামার্থ সমুপস্থিত হইয়া বীরত্রয়কে শমন সদন দর্শন করাইলেন। তাহা দেখিয়া সূর্পণখা নিকষাগর্ভসম্ভূতা দশস্কন্ধরকে আপনার বিরূপীকরণ বিষয়ক সংবাদাবগত করিয়াছিলেন।

রাক্ষসরাজ সূর্পণখা মুখে রামঘটিত সমস্ত বৃত্তান্ত ও রামপত্নী সীতার রূপলাবণ্যাদির প্রশংসাবগতি করিয়া সীতা গ্রহণে সাভিলাষী হইয়া বাহ্যে ভগ্নিপ্রিয়চিকীর্ষা ছলে সন্ন্যাসীরূপে রামাশ্রমে সমাগত হইয়া রাম লক্ষণ বিরহিত কুটীরস্থা সীতাকে হরণ করিয়াছিল। পুষ্প-কারূঢ় রাবণ পথিগমনকালে গতিবিরোধক পক্ষীরাজ জটায়ুকে বিনিহিত করতঃ লঙ্কায় গিয়া অশোক কাননে সীতাকে রক্ষা করেন।

পরে শ্রীরামচন্দ্র সীতাহরণ জন্য শোক কর্ষিত হইয়া সীতান্বেষণার্থে বানরপতি সুগ্রীবের সহিত সখ্য করিয়াছিলেন। চারি মাস বর্ষায় মাল্যবান পর্ব্বতে অবস্থিতি করিয়া শরদাগমে বানরদূত দ্বারা লঙ্কাস্থিতা জানকীর উদ্দেশ পাইয়া লঙ্কাধিপ বধে প্রযত্নবান হন।

শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনে বসাইয়া তদ্দ্বারা বানরচমূ সংগ্রহ করতঃ সাগরোপরি সেতু বন্ধন করিয়া বানরানীক সমভিব্যাহারে রাবণ নগরী লঙ্কায় প্রবেশ করেন। পরে যুবরাজ অঙ্গদ রামদূত হইয়া রাবণ সভায় গিয়া সংগ্রামকরণার্থে সংবাদ দেন। অনন্তর রাবণ ভ্রাতা বিভীষণ শ্রীরাম-চন্দ্রকে সীতা প্রত্যর্পণ জন্য উপদেশ দেওয়াতে লঙ্কেশ্বর জাতক্রোধী হইয়া বিভীষণকে পদাঘাত করতঃ বিধিমতে অপমানিত করেন। তাহাতে তৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া বিভীষণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করিয়া রামের সহিত মিলিত হন। শ্রীরামও বিভীষণকে প্রাপ্ত হইয়া তদ্দ্বারা লঙ্কার ও রাক্ষসরাজের সম্যক বিবরণ পরিজ্ঞাত হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েন।

রাজাধিপতি রাবণ ত্রিলোক বিজয়ী ছিলেন। তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ধনাধিপতি কুবের। সুতরাং বলা বাহুল্য যে রাবণের

কোষাগার পরিপূরিত ছিল। তিনি স্বয়ং বরদর্পিত মহাবীর পুরুষ। তাঁহার পুত্র পৌত্রাদি সকলেই সংগ্রামকুশল। ত্রিলোক-গ্রাসক অনুজ ভ্রাতা মহাবীর কুম্ভকর্ণ এবং বিদ্যুজ্জিহ্বাদি অনেকানেক কৌশলকারী যন্ত্র নির্ম্মাতা শিল্পকর ছিল। তাহারা অভাবনীয় এক এক প্রকার শিল্প দ্বারা জগৎকে সম্মোহিত করিয়াছিল। এরূপ বহুতর ধনজনাদি সম্পন্ন রজনীচর রাজা সপ্ত উপদ্বীপা ধরণীকে জয় করিয়া স্বয়ং ত্রিলোকাধিপত্য গ্রহণ করিয়াছিল। লঙ্কার দুর্গ অতি দুর্গম, সুদৃঢ় তাম্র লৌহাদি ধাতুতে প্রাচীর বিনির্ম্মিত, এবং অজেয়রূপে পরিগণিত ছিল। একারণ রাবণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে নিরস্ত্র বানরী-সেনা সহায়ে লঙ্কা প্রবেশ পূর্ব্বক রাক্ষসকুল জয়ে কখনই কোন মনুষ্য সমর্থ হইবে না। সুতরাং বিভিষণ বাক্যের অনাদর করতঃ তিনি রামের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণ প্রমুখাৎ সমুদয় গোপনীয় সন্ধান অবগত হইয়া রাবণের সহিত যুদ্ধ করিয়া সদলবলে রাক্ষসাধিপতিকে বিনাশ করতঃ দুর্ভেদ্য লঙ্কাদুর্গকে একেবারে ছারখার করিয়াছিলেন। সবংশে রাবণ হত হইলে বিভীষণকে তৎপুরাধীশ্বর করতঃ সীতা লইয়া পুনঃ অযোধ্যায় আগমন করেন এবং চারি ভাই একত্র মিলিত হইয়া রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন।

পুরাবৃত্তে জনশ্রুতি আছে যে রাম-রাজ্যে প্রজার কোন উদ্বেগ বা আধিব্যাধি, জরা রোগ, অকাল মৃত্যু ছিল না, নিরাময় স্বচ্ছন্দসুখে প্রজাগণ কালযাপন করিয়াছেন, সর্ব্ব শস্যে পৃথিবী পরিপূর্ণা, অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্ট্যাদির শঙ্কা ছিল না।

লক্ষণ যমুনার উপকূলাবধি সাগরান্ত দক্ষিণদেশের পরিরক্ষণার্থে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ভরত, সংগ্রামে গন্ধর্ব্ব রাজ্য জয় করিয়া তদ্দেশে আধিপত্য করেন। শত্রুঘ্ন লবণকে নিহত করিয়া মথুরার রাজা হন, কিন্তু সকলেই রামাজ্ঞাবশবর্ত্তী ছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী।

বসন্তে।

(১)

দখিন হাওয়ার প্রথম পরশ
লাগল যখন প্রাণে,
হৃদয় আমার ভেসে গেল
পুলক-স্রোতের টানে।
শুষ্কপত্র মর্ম্মরিল,
নবীনতা মুঞ্জরিল,
আকুল ভ্রমর গুঞ্জরিল
আপন মনে মনে।

(২)

প্রভাত এল হেসে হেসে
সোনার বরণ রথে,
রক্ত উজল অরুণ কিরণ
ছড়িয়ে সারা পথে।
দখিন দুয়ার খোলা পেয়ে,
মত্ত পবন ধেয়ে ধেয়ে,
কি বারতা এল গেয়ে
যোজন শতে শতে?

(৩)

প্রচণ্ড এই রৌদ্র তাপে
ফাগুন দ্বিপ্রহরে,
বসন্তরাজ অতিথি আজ
ভুবন-ভবন দ্বারে।
নিঃশ্বাসে তার মলয় পবন,
ইন্দ্রধনুর মধুর বরণ,
শ্যামলতা অঙ্গাভরণ
গায় সে কুহুর সুরে।

(৪)

গোধূলির ধূসরতা
আকাশ যখন মাখে
পাখীরা সব কূজন গানে
ফিরে লাখে লাখে
গন্ধে ভরা পুষ্প ছেড়ে
ভোমরা গেছে ঘরে ফিরে
হৃদয়তারে স্বপন সুরে
বাজাল সুর ওকে ?

(৫)

মায়াপুরীর সোনার কিরণ
কেগো বর্ষি গেল ?
(কখন) প্রাণে প্রাণে পারিজাতের
কোমল গন্ধ এল' ?
নীল আকাশের নীরবতা,
প্রাণে জাগায় ব্যাকুলতা,
এই কি তোমার সফলতা
মনের মাঝে জাগল ?

শ্রীপ্রভবদেব মুখোপাধ্যায়।

আত্ম-বিসর্জ্জন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

[শ্যামনগর নরেন্দ্রকৃষ্ণের বাটী। নরেন্দ্র ও হেমচন্দ্র]

নরেন্দ্র। আপনাকে পেয়ে আজ আমি বড় সুখী হ'য়েছি। আপনার মতন বিজ্ঞ লোক একটী আমি অনেক দিন ধ'রে খুঁজ্‌ছিলুম্। এতদিনে ভগবান্ আমার আশা পূর্ণ কর্লেন্। এসমস্ত বাড়ী-ঘর আপনার মনে কর্ব্বেন্। কোন বিষয়ে কুণ্ঠিত হবেন্না! আপ্‌নার যখন যা দর্‌কার হ'বে, অনুমতি ক'র্ব্বেন্। কোন বিষয়ে আপনার যেন কোন কষ্ট না হয়, এই আমি চাই।

হেম। আমিও আপ্‌নার মত প্রভু পেয়ে বড় সুখী হলুম্। বড় ভাব্‌ছিলুম কেমন ক'রে মনিবের মন যোগাব। আপ্‌নার সঙ্গে পরিচয় হ'য়ে আমার সে ভয় দূর হ'ল। আপ্‌নার মতন উদার লোকের মনস্তুষ্টি-সাধন ক'র্ত্তে অধিক প্রয়াস পেতে হবেনা।

নরে। ও কি কথা বল্‌ছেন? আমি আপ্‌নাকে বন্ধু ব'লে মনে কর্‌ছি। আপ্‌নিও আমাকে তাই ভাব্‌বেন্।

হেম। আমি অদৃষ্টের সঙ্গে যুদ্ধ কর্ত্তে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছি। আপ্‌নার মতন লোকের অধীনে থাক্‌বো, এ আমার পরম সৌভাগ্য!

[জহরলালের প্রবেশ।]

নরেন্দ্র। এই যে জহর এসেছ। (হেমচন্দ্রকে দেখাইয়া) আমার ছোট ভাই এঁকে পাঠিয়ে দিয়েছে। আজ থেকে আমার বিষয়ের সমস্ত ভার এঁর জান্‌বে। তুমি এঁর তত্ত্বাবধান ক'র্ব্বে। দেখ্‌বে যেন কোন বিষয়ে কোন দিন এঁর কোনও কষ্ট না হয়। উত্তরের বাগান বাড়ীটা এঁর বাসার জন্যে দেবে। লোকজন, জিনিষ পত্র, যখন যা দরকার হবে, তা' তুমি সব ঠিক ক'রে দেবে। দেখ বিদেশে এসেছেন, যেন কোন কষ্ট না পান্।

জহ। যে আজ্ঞে। (স্বগতঃ) ওঃ—বাবারে! কে আমার নবাব খাজাখাঁ এসেছেন, তাঁর জন্যে এত বন্দোবস্ত? চাকরি ক'র্ত্তে এসেছে, মাইনে নেবে, চাকর, তার জন্যে এত কেন?

নরে। (হেমচন্দ্রের প্রতি) দেখুন্ হেমবাবু! আপ্‌নি এঁর কাছ থেকে কাগজ-পত্র সব বুঝে নেবেন্। ইনি হচ্ছেন আমার একজন পুরোণো বিশ্বস্ত লোক। আমার ম্যানেজারের মৃত্যুর পরথেকে ইনিই আপাততঃ সে কাজ কর্চ্ছিলেন। কিন্তু এত বড় ষ্টেটের কাজ ইনি একা পেরে ওঠেন্ না। ইনি আপনার সহকারীরূপে থাক্‌বেন। আপনি এঁর কাছ থেকে কাজকর্ম্ম কাগজপত্র সব দেখে শুনে নেবেন্।

হেম। যে আজ্ঞে।

জহর। (স্বগতঃ) আমি প্রবীণ লোক, আর ওটা একটা ছোঁড়া বল্লেই হয়, আমি থাক্‌ব ওঁর সহকারী হয়ে?

নরে। দেখুন্ হেমবাবু! কাজ-কর্ম্ম ক'র্ত্তে দিন কতক আপনার বড়ই কষ্ট হবে। বিষয়-সম্পত্তির বড়ই গোলমাল হ'য়ে আছে। পুরাণো ম্যানেজার মারা গেছেন, তারপর বাবা মারা গেলেন, আর উপযুক্ত লোক পাইনি, নিজে কিছুই বুঝি না, বাপের আদুরে ছেলে ছিলুম, ঘুরে ফিরে আমোদ ক'রে বেড়িয়েছি, ও-সব কিছুই দেখতুম্ না! এখন বিষয় নিয়ে ভারী মুস্কিলে প'ড়েছি। জানেন্-ইত, আজকালকার বাজারে বিশ্বাসী লোক পাওয়াই যায় না। যে যা পাচ্ছে তাই, কর্চ্ছে, পাঁচজনে লুট ক'রে নিচ্ছে।

হেম। আশা করি আমি কিছু দিন আপনার কাজ ক'র্লে, সমস্ত বিষয় দুরস্ত ক'রে দিতে পার্ব্ব।

নরে। নিশ্চয়ই পার্ব্বেন্। ধার্ম্মিক বিশ্বাসী লোকের হাতে পড়্‌লে অনায়াসেই আমার বিষয় দুরস্ত হয়ে যাবে। আমি মানুষের মুখ দেখ্‌লে মানুষ চিন্তে পারি। আপনার ঐ সৌম্য মূর্ত্তিতে আপনার হৃদয়ের ভাব স্পষ্ট প্রকাশ পাচ্ছে।

হেম। এ আপনি অযথা আমার প্রশংসা কর্চ্ছেন্। আগে আপ্‌নি দেখুন্, আমি আপনার কি-রকম কাজ কর্ম্ম করি!

নরে। আমি ত বলেইছি যে, আমি মানুষের মুখ দেখ্‌লে মানুষ চিন্তে পারি! আমার পরম সৌভাগ্য যে, আপ্‌নার মতন লোক আমার ম্যানেজারী ক'র্ত্তে এসেছেন্।

হেম। (স্বগতঃ) লোকটিকে দেখে বড় ভাল লোক বলেই মনে হচ্ছে! কিন্তু মানুষের সময়ও অদৃষ্টের গুণে কর্ম্মের বিকাশ পায়। আমার এখন বড় দুঃসময়, জানি না ঈশ্বর কি ক'র্ব্বেন্।

নরে। চলুন্ একটু বিশ্রাম ক'র্বেন্।

(জহরের প্রতি) তোমাকে যা বল্লুম্, তা' ঠিক্ ক'রে রাখ্‌বে। এঁর যেন কোন কষ্ট না হয়।

[হেমচন্দ্রকে লইয়া নরেন্দ্রকৃষ্ণ চলিয়া গেলন্।]

জহর। বার বার কেবল, দেখ যেন এঁর কষ্ট না হয়, 'দেখ' যেন এঁর কষ্ট না হয়'! কেন্‌রে বাবু? কে গুরুঠাকুর এসেছে? লোকটা কি যাদুকর নাকি? একেবারেই যে বাবুকে বশ করে ফেল্লে, দেখ্‌তে পাচ্ছি! কি আশ্চর্য্য! আমি আজ ত্রিশ বছর এই কাজ কর্চ্ছি, আমাকে যে বিশ্বাস নেই,—আর ও লোকটাকে একবার চখের দেখা দেখেই, এত বিশ্বাস? "বিশ্বাসী লোক পাওয়া যায় না," "সবাই লুটে খাচ্ছে,"—এসব কা'কে উপলক্ষ্য ক'রে বলা হ'ল? কথা কইতে কইতে দু'তিন বার আমার মুখের দিকে চেয়েছিল। কি অপমান! এতদিন কাজ ক'রে শেষ দশায়,—এই বুড়ো বয়েসে, কিনা একটা ছোঁড়ার অধীনে আমায় কাজ ক'র্ত্তে হবে? বাবুর বল্‌তেও একটু লজ্জা হ'লনা? আমরা চোর? আমরা অবিশ্বাসী? আর কোথাকার কে একটা বিদেশী লোক এসে ওঁর বিশ্বাসী হবে? জামাই আদরে থাক্‌বে, সুখ্যাতির উপরে সুখ্যাতি কিন্‌বে, আর আমরা হাংলা কুকুরের মতন তার প্রসাদ পাবার জন্যে মুখের দিকে চেয়ে থাক্‌ব? না, না, তা কখনও হবে না, ঐ ছোঁড়ার গোলাম হ'য়ে কখনও কাজ ক'র্ত্তে পার্ব্বো না যেমন ক'রে পারি ওকে তাড়াব, তাড়াব, তাড়াব, তবে আমার নাম জহর! এত স্পর্দ্ধা! আমি ওর অধীনে কাজ কোর্ব্বো? আমি ওর সহকারী হব? আমি পুরণ চাকর, আমাকে ম্যানেজারী দিলে কি ক্ষতি হ'ত? কি লোকশান্ হ'ত? আচ্ছা, আমিও একবার দেখ্‌ছি। যেমন ক'রেই হোক্ পাজী ব্যাটাকে তাড়াতেই হবে।

[প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[হেমচন্দ্রের বাটীর সংলগ্ন পুষ্পোদ্যান। —রমা—]

রমা। মানুষের এক জীবনেই কত পরিবর্ত্তন হয়! দেহের পরিবর্ত্তন, মনের পরিবর্ত্তন, অবস্থার পরিবর্ত্তন, কত পরিবর্ত্তনই হয়! মনটা যেন ক'দিন ধ'রে অস্থির হয়ে রয়েছে। কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না। ক'দিন তিনি আসেন্‌নি কেন? অসুখ করেনি ত? বাবা চ'লে গিয়ে অবধি ত তিনি প্রায় দিন-রাতই আমাদের বাড়ী থাক্‌তেন্। আজ ক'দিন ধ'রে একবারও দেখ্‌তে পাই নি! মনে হয়, কা'কেও জিজ্ঞাসা করি, আবার লজ্জা করে। কেন লজ্জা করে কে জানে? আগে ত এমন হ'ত না। তাই বলি, বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে মনের পরিবর্ত্তন হয়। তাঁর খপর জান্‌বার জন্যে মনটা ছট্‌ফট্ ক'র্চ্ছে, কিন্তু মুখফুটে তাঁর কথা কাকেও জিজ্ঞাসা ক'র্ত্তে সাহস হ'চ্ছেনা। কি আশ্চর্য্য! তিনি আমার কে? কেউত ন'ন্! তবে তাঁকে দেখ্‌বার জন্যে মন এমন করে কেন?

[রমা গান গাহিতে লাগিল। প্রফুল্ল ধীরে ধীরে আসিয়া রমার পশ্চাতে দাঁড়াইলেন।]

রমা। কেন প্রাণে জাগে সে-বদন?
কেনবা হেরিতে তারে আকুল পরাণ মন!

আকাশ-কুসুম সম,
কেনবা হৃদয়ে মম
নবীন-বাসনারাশি আসি দেয় দরশন!
বসায়ে হৃদয়ো পরে
মনে হয় পূজি তারে,
সাধ হয় তারি করে ডালি দিতে এ জীবন!

প্রফু। রমা! কাকে উপলক্ষ্য ক'রে এ গান গাচ্ছিলে? সে কোন ভাগ্যবান্?

রমা। (স্বগতঃ) ছিঃ ছিঃ, সব শুন্তে পেয়েছেন?

[লজ্জায় নতমুখী হইলেন]

প্রফু। (সহাস্যে) বলনা রমা?

রমা। (লজ্জানতমুখে) তুমি কখন এসেছ? আমি জান্তেই পারি নি।

প্রফু। এই একটু আগে এসেছি। তোমার এ গান শোনা যে আমার ভাগ্যে ছিল!

রমা। (লজ্জায় নতমুখী রহিলেন)

প্রফু। [সযত্নে রমার হাত ধরিয়া] আমার কাছে এত লজ্জা কেন, রমা?

রমা। তুমি ক'দিন আসনি কেন? ভাল আছ ত?

প্রফু। হ্যাঁ রমা, একজামীনের জন্যে ক'দিন ভারী ব্যস্ত ছিলুম, তাই আস্তে পারি নি।

রমা। একজামীন শেষ হয়ে গেছে?

প্রফু। হ্যাঁ, হয়েছে।

রমা। এবার রোজ আস্বে?

প্রফু। আসব। আমি না এলে তোমার মন কেমন করে?

রমা। [নীরব]

প্রফু। বলনা রমা? আমার জন্যে মন কেমন করে?

রমা। করে বই কি।

প্রফু। (রমার হাত ধরিয়া) কেন করে রমা?

রমা। তা বল্তে পারি না। বোধ হয়, তুমি আমাদের যত্ন কর ব'লে।

প্রফু। শুধু কি এই জন্যে?

রমা। (নীরব)

প্রফু। বল রমা! বল আমাকে ভাল বাস কি?

রমা। তোমার কি আমার জন্যে মন কেমন করে না?

প্রফু। আমার? কেমন ক'রে বল্ব রমা? মন ত কাকেও দেখাবার নয়? যদি দেখাবার হত তাহলে দেখাতুম্।

[সুবোধের প্রবেশ।]

সুবো। প্রফুল্লবাবু যে? এতদিন আসেন্নি কেন?

প্রফু। বড় ব্যস্ত ছিলুম্, তাই কদিন আস্তে পারিনি, ভাই!

সুবো। হ্যাঁ, তাই বই কি? আপ্নি ভারি দুষ্টু। বাড়ী থেকে বেরুলে আর আপনার কিছু মনে থাকে না!

প্রফু। কেন ভাই?

সুবো। আপ্নি বলেছিলেন কাল আমাকে চিড়িয়াখানা দেখাতে নিয়ে যাবেন্, এই বুঝি আপ্নার কাল?

প্রফু। ওঃ—হো। ভুলে গেছলুম্ ভাই! কাল তোমাকে নিশ্চয় নিয়ে যাব।

সুবো। হ্যাঁ,—আর আপনার কাল নিয়ে যেতে হবে না। আমি হরিকাকার সঙ্গে দেখে এসেছি।

রমা। ছিঃ—সুবোধ, তুমি বড় দুষ্টু

হয়েছ! প্রফুল্লবাবুর সঙ্গে এত্নি ক'রে কথা কয় কি? আমি মা'কে সব বলে দোব।

প্রফু। কেন রমা! আমাকে পর মনে হয় বুঝি?

রমা। না, না, তা নয়।

সুবো। প্রফুল্লবাবু, হরিকাকা আমাকে মস্ত একটা কাকাতুয়া কিনে দিয়েছে, বাড়ীতে চলুন্ আপনাকে দেখাব।

প্রফু। চল যাচ্ছি।

সুবো। দিদি, এস না? সন্ধ্যে হ'য়ে এল!

রমা। তোমরা যাও। আমি একটু পরে যাচ্ছি।

সুবো। হ্যাঁ, দিদির কেমন ঐ দোষ! এখানে এলে পরে দিদি আর বাড়ী যেতে চায় না। চুপ্‌টি ক'রে একলা বসে থাক্‌বে, ভাব্‌বে, কাঁদ্‌বে, গান গাইবে। চলুন্ প্রফুল্ল বাবু! আমরা যাই।

[সুবোধ প্রফুল্লর হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেল।]

রমা। সুবোধ বলেছে মিছে নয়! এখানে এলে আমার আর সত্যিই বাড়ী যেতে ইচ্ছে করে না। এ জায়গাটি বড় সুন্দর! সন্ধ্যার মৃদু বাতাস বইছে, ফুলগুলি কেমন একটি একটি ক'রে ফুটে উঠ্‌ছে, আকাশে চাঁদ উঠ্‌ছে, তারাগুলি কেমন একে একে জ্ব'লে উঠ্‌ছে, আহা কি সুন্দর দৃশ্য! এই বেদীটার উপরে একটু বসি। বাবা আমার রোজ এমিসময় এইখানে বসে থাকতেন্।

[মর্ম্মরপ্রস্তরের বেদীর উপরে বসিয়া]

ভগবানের সৃষ্টির সবই সুন্দর! একদিকে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে, একদিকে চাঁদ উঠ্‌ছে, একদিকে দিনের আলো চলে যাচ্ছে, অন্য দিকে সন্ধ্যার অন্ধকার উঁকি দিচ্ছে। কেমন সুন্দর ফুল ফুটেছে, ফুলের সুগন্ধে মনের কি তৃপ্তি হচ্ছে। চারিদিকে আরতির শাঁক ঘণ্টা বাজ্‌ছে! এ সময়টি ভগবানের নাম কর্ব্বার বড় উপযুক্ত সময়! তাই ঋষিরা সন্ধ্যা-বন্দনার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন্! সমস্ত দিনের পরে মানুষ এই সময় একটু ভগবানের নাম ক'রে মনে শান্তি পায়!

[রমা গাহিতে লাগিলেন]

মাখি ফুল-পরিমল তারা-হার পরি গলে,
এস ওগো সন্ধ্যারাণী নেমে এস ধরাতলে!
কুসুম-সুবাস লয়ে,
অনিল যেতেছে ব'য়ে,
তোমার পূজার তরে, কুমুদ ফুটেছে জলে!
ছড়ায়ে কিরণ-রাশি,
শশী হাসে মধু-হাসি,
এস সতি! সেজে এস ব'স পতি-পদতলে!

[উদ্যানের প্রাচীর অতিক্রম করিয়া উল্লম্ফনপূর্ব্বক প্যারিচাঁদ ও গোবর্দ্ধনের প্রবেশ।]

গোবর্দ্ধন। বিবিজান, বেশ গাইছ যে! বাবুর মন একেবারে তর্-র্-র্ ক'রে দেবে!

প্যারি। চুপ্ শালা! চুপ্! এখানে কোন কথা নয়!

রমা। (ভীত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া) কে তোমরা? এখানে কেন এসেছ? এ বাগানে কি ক'রে ঢুক্‌লে?

প্যারি। [গোবর্দ্ধনের প্রতি] রুমাল-খানা কোথায়? শীগ্‌গির মুখটা বেঁধে ফেল। নইলে এখনি চ্যাঁচাবে।

রমা। কি? তোমরা আমাকে বাঁধ্‌বে কেন? সুবোধ,—সুবোধ,—প্রফুল্ল বাবু—

গোব। আর প্রফুল্লবাবু নয়, এই-বার—

প্যারি। গাধা, কি বল্‌ছিস? শীগ্‌গির কাজ শেষ করেনে, দেরী হ'য়ে যাচ্ছে!

রমা। হায়! কেন তাদের সঙ্গে গেলুম না?

[রমার মুখ-বন্ধন করিয়া উভয়ে রমাকে ধরিয়া লইয়া গেল।]

[অন্নপূর্ণার প্রবেশ]

অন্ন। রমা! সন্ধ্যে হ'য়ে গেল মা, একলাটী এখানে কেন বসে রয়েছিস্? (দেখিয়া) কই, রমা ত' এখানে নেই! কোথায় গেল? সুবোধ যে ব'ল্লে এইখানে ব'সে আছে! তাইত, কোথায় গেল?

[ছুটিয়া সুবোধের প্রবেশ।]

সুবো। মা, মা,—দিদিকে কা'রা ধরে নিয়ে গেল!

অন্ন। সেকিরে? ধরে নিয়ে গেল কি? কে ধরে নিয়ে গেল?

সুবো। কি জানি মা! কারা দু'জন দিদিকে বেঁধে জোর করে গাড়ীতে তুল্লে!

অন্ন। কি সর্ব্বনাশ! তুই চেঁচালিনা কেন? কি হ'বে?

সুবো। আমি দিদিকে ডেকে নিয়ে যাবার জন্যে ফিরে আস্‌ছিলুম, দেখ্‌লুম, গেটের ধারে কার গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারা দিদিকে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে, আমি চেঁচিয়ে উঠ্‌লুম, কেউ শুন্‌তে পেলে না। সেখানেত কেউ ছিল না, মা?

অন্ন। কি হবে? ভগবান্! একি কর্লে? প্রফুল্ল কোথায়?—চলে গেছে?

সুবো। না, বাড়ীতে আছেন্।

অন্ন। যা বাবা, শীগ্‌গির প্রফুল্লকে ডেকে আন্ দেখি!

সুবোধ। যাই। (প্রস্থানোদ্যত) ঐ যে মা, প্রফুল্লবাবু এইখানেই আসছেন্।

[প্রফুল্লর পুনঃ প্রবেশ।]

অন্ন। প্রফুল্ল! সর্ব্বনাশ হয়েছে। জাত-কুল-মান, সব গেল।

প্রফু। কি হয়েছে?

অন্ন। রমাকে কারা ধ'রে নিয়ে গেছে।

প্রফু। ধরে নিয়ে গেছে!! অ্যাঁ, সেকি কথা? এইত সে এখানে বসেছিল।

অন্ন। কি জানি বাবা, সুবোধ বল্‌ছে, ধরে নিয়ে গেছে!

প্রফু। সুবোধ ছেলেমানুষ, কি বল্‌তে কি বল্‌ছে। বোধ হয়, সে বাড়ী গিয়ে থাক্‌বে, চলুন্ দেখি গিয়ে।

সুবোধ। না প্রফুল্লবাবু, আমি দেখেছি কা'রা দু'জন দিদিকে ধ'রে জোর ক'রে গাড়ীতে তুল্লে। দিদির মুখ বেঁধে দিয়েছিল। আমি চেঁচিয়ে উঠ্‌লুম, কিন্তু সেখানে কেউ ছিল না, কেউ শুন্‌তে পেলে না।

প্রফু। অ্যাঁ, কখন দেখ্‌লে? কোন্ দিকে নিয়ে গেল তারা? একি বিপদ্! না, আর দেরী করা হবে না। আপনি স্থির হোন্ মা! ভয় নেই, আমি এখনি রমাকে আপনার কাছে এনে দোব।

[প্রফুল্লর দ্রুত প্রস্থান।]

সুবোধ। মা, ঘরে চল। এখানে আমার বড় ভয় কচ্ছে।

অন্ন। চল বাবা! সর্ব্বেশ্বরকে, হরিদাসকে খপর দিই গে। নারায়ণ! এ কি কর্লে? এ কি বিপদের উপর বিপদে ফেল্লে হরি!

[উভয়ের প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য।

পথ।

(একদিক দিয়া প্রফুল্ল অপর দিক দিয়া লীলার পরিচারিকার প্রবেশ।)

পরি। প্রফুল্লবাবু, আপনার একখানা চিটি আছে।

প্রফু। চিটি? কে দিয়েছে?

পরি। বৌ-দিদি।

প্রফু। আমায়? সে কি?

পরি। হ্যাঁগো, এই নাও।

প্রফু। আমায় চিটি দিয়েছে? কি বল্‌ছ তুমি?

পরি। হ্যাঁগো, আমি কি মিছে কথা বল্‌ছি? ভাল বিপদ্! এই দেখনা কেন?

প্রফু। না, বাবু আমি চিটী-পত্র কিছু নিতে পার্ব্বো না, তুমি যাও!

পরি। সেকি কথা গো! ভারী দরকারী চিটী যে!

প্রফু। (ইতস্ততঃ করিয়া) দেখি দাও। (পত্রপাঠ) ওঃ—হুঁঃ—আমি ঠিক্‌ই ভেবে ছিলুম্। চিঠিখানা কিছু আগে পেলে কাজ হ'ত। (পরিচারিকার প্রতি) তুমি যাও।

[পরিচারিকার প্রস্থান।

একেবারে পুলিশ নিয়ে গেলেই ঠিক্ হয়। কিন্তু তাহলে আবার একটা কেলেঙ্কারী হয়। যাক্—দরকার নেই।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

(মণীন্দ্রের বৈঠক্‌খানা মণীন্দ্র ও হারাধন।)

হারা। মণিবাবু, খাও বাবা! (নিজে মদ্যপান করিয়া মণীন্দ্রকে দিল)

মণীন্দ্র। দাও। (পান করিয়া) কিন্তু ভাই, আজ আমার কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না। প্যারি এখনও ফির্‌ল না!

হারা। ভয় কি চাঁদ? এখনি তোমার আঁধার হৃদয় আলো ক'রে প্যারিচাঁদ উদয় হবে।

মণীন্দ্র। না, হে না। যে কাজে গেছে, কি জানি কি করে আস্‌বে। আমার মনটা কিছুতেই স্থির হচ্ছে না।

হারা। কুছ্‌পরোয়া নেই, বাবু সাব! কাম সাফ্ ক'র্কে আভি দোস্ত আবে গা।

মণীন্দ্র। তুমি যাই বল না কেন, আমার মন বুঝ্‌ছে না। ভয় হচ্ছে! আশায় নিরাশায় প্রাণটা টল্‌মল্ ক'চ্ছে!

হারা। ভ্যালা মোর ভাই রে! বিরহ-শয়নে শয়ন ক'রে সুন্দরীর মুখ-পদ্মখানি ভাব্‌ছ বুঝি?

(রমাকে লইয়া প্যারিচাঁদ ও গোবর্দ্ধনের প্রবেশ।)

প্যারি। এই নাও বন্ধু! তোমার বহু-কালের আশার জিনিষ এনেছি মনপ্রাণ ঠাণ্ডা কর। হেমঘোষের অপমানের প্রতিশোধ নাও।

মণীন্দ্র। (অগ্রসর হইয়া) এসেছ? এনেছ? কি ক'রে পেলে? কেমন ক'রে আন্‌লে?

প্যারি। হাঃ—হাঃ! আমি আস্‌মান থেকে চাঁদ ধ'রে আন্‌তে পারি বন্ধু! এ ত' কোন্ কথা? আমি যে কাজে যাব, সে-কাজ কি কখনও নিষ্ফল হয়, দাদা?

(রমার বন্ধন মোচন।)

হারা। বাহবা! এ কেয়া চিজ্? স্বর্গের না মর্ত্ত্যের?

রমা। এ কি, এ তোমরা আমাকে কোথায় আন্‌লে? আমাকে এখানে কেন নিয়ে এসেছ?

প্যারি। হাঃ—হাঃ—! তোমায় আজ বিয়ে সুন্দরী, বিয়ে! এইবার যত পার ডাক তোমার প্রফুল্ল বাবুকে। যমেরও সাধ্য নেই যে, এখান থেকে তোমাকে টেনে বার করে।

রমা। কে তোমরা? কেন আমাকে ধ'রে আন্‌লে?

আমার সঙ্গে ত তোমাদের কোনও শত্রুতা নেই!

হারা। আছে বৈকি? পৈতৃক একটু একটু আছে।

রমা। তোমাদের পায়ে পড়ি, আমাকে ছেড়ে দাও। আমাকে রেখে এস।

গোব। হ্যাঁ, রেখে আস্‌বার জন্যেইত এত কষ্ট করে ধ'রে আনা হ'ল।

হারা। এগিয়ে এস বিবিজান, এগিয়ে এস, বাবুর পা, টিপে দাও।

প্যারি। নাও, মণিবাবু, আলাপ কর।

[প্যারি ইয়ার দ্বয়কে চলিয়া যাইতে ইসারা করিল তাহারা মুখ-ভঙ্গী করিয়া চলিয়া গেল]

মণীন্দ্র। (জড়িত স্বরে) এগিয়ে—এস।

রমা। কে তুমি?

মণীন্দ্র। আমাকে চিন্‌তে পাচ্ছ না? আমি মণীন্দ্র!

রমা। মণীন্দ্র? এ নাম আমি কখনও শুনি নি! আমাকে তোমার কি প্রয়োজন?

মণীন্দ্র। প্রয়োজন আছে বই কি! এমন জিনিষে কার না প্রয়োজন থাকে?

রমা। পরিহাস কোরোনা, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় ছেড়ে দাও।

মণীন্দ্র। পরিহাস করিনি, সত্যি কথা বল্‌ছি। কাছে এস, মনে করেছিলুম তোমাকে দিয়ে পা টেপাব, কিন্তু দেখ্‌ছি তুমি পা টেপ্‌বার উপযুক্ত নও; তুমি বুকে রাখ্‌বার জিনিষ। এস এগিয়ে এস, (অগ্রসর হইয়া) কথা শোন।

রমা। (পশ্চাৎপদ হইয়া) বিনা অপরাধে কেন আমাকে বেঁধে আন্‌লে? আমি ত তোমাদের কোন অনিষ্ট করিনি! আমাকে ছেড়ে দাও,—তোমাদের পায়ে পড়ি, আমাকে ছেড়ে দাও!

মণীন্দ্র। কাছে এস, ভয় কি? আমিও তোমার মতন মানুষ।

[অগ্রসর হইয়া রমার হাত ধরিতে গেল]

রমা। (দ্রুত পশ্চাৎপদ হইয়া) মানুষ? তোমরা মানুষ? অসহায়া বালিকাকে এমি ক'রে ধ'রে এনে এত অপমান ক'চ্ছ, তোমরা মানুষ? তোমরা পশুরও অধম!

মণীন্দ্র। (সক্রোধে) কি? ছোটমুখে বড় কথা? আমার ঘরে দাঁড়িয়ে, আমার মুখের উপর এমি উত্তর? দেখি, কে আজ তোকে রক্ষা করে।

[দ্রুত অগ্রসর হইয়া রমার হাত ধরিল]

[রমা হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল]

রমা। ছাড়, শীগ্‌গির ছাড়। যদি নিজের মঙ্গল চাও তবে এখনও বল্‌ছি, হাত ছাড়। মাথার উপরে ঈশ্বর আছেন, একবার উপর দিকে চেয়ে দেখ। এত অধর্ম্ম তিনি কখনও সইবেন্ না।

প্যারি। ওরে বাবা! ছুঁড়ীর কথা শোন্!

মণীন্দ্র। একটা কথা বলি শোন, কেন ইচ্ছা ক'রে অপমান হবে?

[রমার হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিল]

রমা। রক্ষা কর, আমাকে রক্ষা কর, কে আছ অসহায়া বালিকাকে রক্ষা কর! ভগবান্! এ আমার কোন মহাপাতকের ফল?

মণীন্দ্র। কোথায় যাবে সুন্দরি! এই আঁধার হৃদয় আলো ক'রে তোমায় থাকতে হবে। কতদিন ধ'রে চেষ্টা ক'রে, তবে তোমায় পেয়েছি, অনেক দিনের বাসনা আজ পূর্ণ কোর্ব্বো।

রমা। ওগো কে কোথায় আছ, আমাকে পিশাচের হাত থেকে রক্ষা কর।

[মণীন্দ্রের হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল]

[ছুটিয়া লীলার প্রবেশ]

লীলা। ভয় নেই, বোন্! আমি আছি, (রমাকে জড়াইয়া ধরিলেন) আমি তোমায় রক্ষা কোর্ব্বো।

মণীন্দ্র। একি? তুমি এখানে কেন, মেয়েমানুষ?

লীলা। (রমাকে দেখাইয়া) এও ত মেয়ে মানুষ, এ এখানে কেন বল্‌তে পার?

মণীন্দ্র। ওকে আমার দরকার আছে। তুমি ঘরের বৌ এত লোকের সাম্‌নে বাইরে কেন? ভাল চাও ত শীগ্‌গীর চলে যাও। তুমি এখানে কি ক'র্ত্তে এসেছ?

লীলা। আমি নারী, তাই নারীর মর্য্যাদা, সতীর সতীত্ব কুমারীর ধর্ম্ম রক্ষা ক'র্ত্তে এসেছি।

মণীন্দ্র। ওঃ—ভারি আমার রক্ষাকর্ত্তা! ভাল চাও ত ছেড়ে দিয়ে চলে যাও।

লীলা। না, কিছুতেই যাব না।

মণীন্দ্র। কি? যাবি না?

লীলা। না।

মণীন্দ্র। প্যারি! শীগ্‌গির এর হাত হাত থেকে মেয়েটাকে ছাড়িয়ে নাও ত'!

(প্যারি লীলার কাছ হইতে রমাকে টানিয়া আনিতে যাইল।)

লীলা। (লীলা বিরক্তি ও ঘৃণা ও তেজস্বিতার সহিত বলিলেন) খপরদার! নীচ কুলাঙ্গার!

প্যারি। (চমকিয়া উঠিল) ও বাবা! এ ছুঁড়ী যে আবার আগুণের ফুল্‌কি!

মণীন্দ্র। এখনও ভাল করে বল্‌ছি, চলে যাও।

রমা। (লীলার প্রতি) তুমি কে তা' জানি না, তুমি যেই হও, তুমি দেবী, আমাকে রক্ষা কর, আমায় ছেড়ে চলে যেও না!

লীলা। না, ভাই যাবনা!

মণীন্দ্র। কি? এখনও গেলে না? (লীলার হাত ধরিয়া টানিয়া) চলে যাও, দূর হও।

লীলা। তুমি এই বালিকাকে ছেড়ে দাও আমি একে নিয়ে চলে যাই।

মণীন্দ্র। হাঁ, তাই দোব! তোমার জন্যেই ত ওকে এনেছি!

লীলা। তবে আমিও যাব না।

মণীন্দ্র। কি? মেয়ে-মানুষের এতবড় আস্পর্দ্ধা! কিছুতে কথা শুন্‌বি নি?

লীলা। তুমি আমার স্বামী, আমি তোমার ধর্ম্ম-পত্নী, সহধর্ম্মিণী, কিছুতেই আমি তোমাকে এ পাপ ক'র্ত্তে দোব না। এ পাপের হাত থেকে আমি যেমন ক'রে পারি তোমায়

রক্ষা কোর্ব্বো। কিছুতেই আমি এ বালিকাকে ছেড়ে দোবো না।

মণীন্দ্র। বটে? তবে দেখি, কি ক'রে রক্ষা কর্ত্তে পারিস্!

(ধাক্কা দিয়া লীলাকে ফেলিয়া দিয়া রমাকে আকর্ষণ করিতে উদ্যত হইলেন।)

রমা। রক্ষা কর ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি, আমায় ছেড়ে দাও।

মণীন্দ্র। ভাল কথায় কেউ নয়! এখনও বল্‌ছি আমার কথা শোন নইলে—

(ইত্যবসরে প্রফুল্ল বেগে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দৃঢ়মুষ্টিতে মণীন্দ্রের গলা চাপিয়া ধরিয়া)

প্রফু। নইলে? নইলে, কি ক'র্ব্বে বল? আর যে কথা বেরুচ্ছে না?

[প্যারি অবসর বুঝিয়া সরিয়া পড়িল]

মণীন্দ্র। (ক্ষীণস্বরে) ওঃ—মরে গেলুম! মরে গেলুম, কে তুমি? ও—উঃ—

প্রফু। (ঈষৎ ছাড়িয়া) চিন্‌তে পার, কে আমি? মণি রায়, তুমি এতদূর বেড়েছ? এম্নি লম্পট তুমি যে, প্রতিবেশীর মেয়ে, যাকে নিজের বোনের মতন দেখা উচিত তাকে সুযোগ পেয়ে নিজের বাড়ীতে ধ'রে এনে, তার উপরে অত্যাচার কর্ত্তে যাচ্ছ। ভেবে দেখ দেখি, তুমি কি? তুমি কি একটা মানুষ? দিনরাত মাতলামি ক'চ্ছ, রাত্রে তোমার চিৎকারে পাড়ার লোক ঘুমুতে পারে না! তোমার চরিত্রগুণে তোমার বাড়ীর মেয়েরাও তোমাকে দেখে ঘোম্‌টা দেয়। এতেতেও তোমার একটু লজ্জা করে না? কি আর বল্‌ব তোমায়, তুমি উপদেশের অনেক বাইরে।

মণীন্দ্র। তুমি কার হুকুমে আমার বাড়ীতে ঢুকেছ? জান, আমি তোমার নামে ট্রেস পাসের চার্জ্জ আন্‌তে পারি!

প্রফু। বটে? আজকাল আবার আইন দেখিয়ে কথা কইতে শিখেছ, যে? আর তুমি যা ক'রেছ, তার কি শাস্তি জান? সুদীর্ঘ কালের জন্য শ্রীঘর বাস! শোন্ মণিরায়! এবার আমি তোমায় ক্ষমা কর্‌লুম্, নিজের বাড়ীতে বসে যা ইচ্ছে তাই কর, তাতে আমদের ক্ষতিবৃদ্ধি বেশী নেই, কিন্তু তার বেশী যদি কিছু কখনও দেখ্‌তে পাই, তখন তুমি আছ, আর আমি আছি। আমি আইন আদালত বুঝি না, ভগবানের কৃপায় এই কব্‌জির জোরই আমার আইন, তা বোধ হয় কিছু পূর্ব্বেই মালুম্ করেছ!

[রমাকে লইয়া প্রফুল্ল চলিয়া গেলেন।]

মণীন্দ্র। কে ওকে খপর দিলে? কি করে ও জান্‌তে পার্লে? কে খপর দিলে?

লীলা। আমি দিয়েছি!

মণীন্দ্র। তুমি? তুমিই—আমার এই শত্রু?

লীলা। না আমি তোমার শত্রু নই, তোমার মঙ্গলের জন্যে-ই করেছি।

মণীন্দ্র। আমার মঙ্গল? আমার আশা নিষ্ফল ক'রে, লোকের কাছে আমাকে অপদস্থ ক'রে, আমার মঙ্গল হচ্ছে? এত বড় স্পর্দ্ধা! (পাদাঘাত করিল) প্রফুল্ল বোস্ তোর কে হয়?

লীলা। কেউ নয়!

মণীন্দ্র। কেন তবে তাকে তুই খপর দিলি?

লীলা। বালিকার রক্ষার জন্যে, তোমার মঙ্গলের জন্যে।

মণীন্দ্র। ফের ঐ কথা? আমার মঙ্গলের জন্যে? আমার ঘোর অনিষ্ট ক'রে, আবার আমার মঙ্গল! বলতে লজ্জা করে না? (পদাঘাত)

লীলা। (পড়িয়া গেলেন) মার, মার, মেরে ফেল, প্রাণের দায়ে আমি মিছে কথা বলব না। যৌবনের উন্মাদনায় আজ তুমি বুঝতে পাচ্ছ না যে, কি কু কাজ ক'র্ত্তে বসেছিলে! কিন্তু একদিন বুঝবে! একদিন অনুতাপের আগুন হৃদয়ে জলে উঠবে। তখন বুঝতে পার্ব্বে, আজ তুমি কি কুকাজ কচ্ছিলে! আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী, আমার উচিত তোমাকে সর্ব্বতো ভাবে পাপের হাত থেকে রক্ষা করা,—তাই আমি জানতে পেরে গোপনে প্রফুল্ল বোস্‌কে খপর পাঠিয়েছিলুম।

মণীন্দ্র। বড় কাজ করে ছিলে! এই তার ফল ভোগ কর।

(পুনঃ পুঃ পদাঘাত করিতে লাগিল]

লীলা। মাগো! গেলুম্!

মণীন্দ্র। মর, মর, আমি নিশ্চিন্ত হই। আর প্রফুল্ল, তোমার বড় তেজ হয়েছে, আচ্ছা, দাঁড়াও, তোমার এ তেজ ভাঙ্গব। যেমন করে পারি, তোমায় জব্দ কোর্ব্বো। আজ থেকে তোমার সর্ব্বনাশ করাই আমার প্রধান কাজ। বড় আশা ক'রে আছ রমাকে বিয়ে ক'র্ব্বে, সে পথ তোমার আগে বন্ধ কর্ত্তে হচ্ছে।

[প্রস্থান।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

ভাবনা ভীতি নাই।

ও তোর ভাবনা ভীতি নাইরে
ও তোর ভাবনা ভীতি নাই!
মনের তরী জীবন-স্রোতে
আপনি চালা ভাই।

হালের রসি ধররে কষে
অকূলে যেন না যায় ভেসে
বিশ্বাসে তুই মধুর হেসে
চালারে তরী ভাই।

গহন রাতে তিমির ঘন
যবে ছাইবে আকাশ তল,
চারিদিকের সজীবতা
তুলবে কলরোল,

তখন তুই ডাকিস মোরে
বাহুর তলে রাখব ঘেরে
ভাবনা ভীতি ভুলে যারে
ও তুই ভাবনা ভীতি ভোল!

ঝঞ্ঝাবাতের ভীষণ ঘাতে
যদি কাঁপিয়ে তোলে তরী
ডাকিস মোরে মনের মাঝি
ডাকিস্ পরাণ ভরি

ভাবনা ভীতি যাবে দূরে
চলবে তরী নামের জোরে
ডাকিস্ ও তুই ডাকিস্ মোরে
ডাকিস্ পরাণ ভরি।

শ্রীপ্রভবদেব মুখোপাধ্যায়।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

স্বর্গীয়া কৃষ্ণভাবিনী দাস—আমরা অত্যন্ত সন্তপ্তচিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে বামাবোধিনীর অন্যতমা লেখিকা "ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা" ও 'জীবনের দৃশ্যমালা' রচয়িত্রী, ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের সদস্যা ও প্রধান কর্ম্মী, আদর্শ রমণী কৃষ্ণভাবিনী দাস মহাশয়া তাঁহার প্রারব্ধিত ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের কার্য্য অসমাপ্ত রাখিয়া, কত নিরাশ্রয় অনাথিনীকে পুনরায় নিরবলম্বন করিয়া ১৭ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার রাত্রি নয় ঘটিকার সময় নশ্বরদেহ ত্যাগ করিয়া পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। এই মনস্বিনী নারীরত্নকে হারাইয়া বঙ্গদেশের নারীজাতির মহাক্ষতি হইল। বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ আদর্শ নারীর একান্ত প্রয়োজন ছিল!

কৃষ্ণভাবিনীর চরিত্রে ভারতনারীর আদর্শ লজ্জাশীলতা, সহিষ্ণুতা, কমনীয়তা, আত্মত্যাগ প্রভৃতি মহদ্গুণ সকল যেমন প্রস্ফুটিত হইয়াছিল তেমনি পাশ্চাত্যদেশের সাহস, তেজস্বিতা, স্বাধিনতা-প্রিয়তা, কর্ম্মনিষ্ঠা, জনহিতৈষণা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা প্রভৃতির অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। এরূপ অমায়িক, আড়ম্বর শূন্য ধীর প্রকৃতির মানুষ দেখা যায় না। এই মহীয়সী নারীর বয়স হইয়াছিল প্রায় ষাটের কাছাকাছি কিন্তু আমরা কখনও তাঁহার মাথার বোমটা একটুও সরিতে দেখি নাই।

ইনি বিখ্যাত শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের পুত্রবধূ ও "পাগলের প্রলাপ" প্রণেতা সুপণ্ডিত দেবেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের পত্নী। ইনি স্বামীর সহিত বহুবৎসর বিলাতে বাস করিয়া আসিয়াছিলেন কিন্তু ইহাঁকে দেখিয়া কেহ মনে করিতে পারিতেন না যে তিনি ধনী গৃহের বধূ কিম্বা পাশ্চাত্যদেশের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিতা বিলাত প্রত্যাগতা!

হায়! আর সে নিস্বার্থ, পবিত্র, উজ্জ্বল, সুন্দর, কমনীয় মুখখানি নারীগণের মধ্যে সকলকার পশ্চাতে কেহ দেখিতে পাইবে না। আর সে পরহিতব্রতে আত্মোৎসর্গকৃতা দেবীকে নারীজাতির সেবার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতে দেখিবে না।

বিধাতা কন্যা ও স্বামীশোকে সন্তপ্তা দেবী কৃষ্ণভাবিনীকে তাঁহার শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান দিয়া চিরশান্তি দান করুন।

সাহিত্য-সম্মিলনে আমন্ত্রণ—এবার হাওড়া-সহরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন। আগামী ওই বৈশাখ শনিবার হইতে অধিবেশন আরম্ভ হইবে। বঙ্গের সাহিত্যসেবী সাহিত্যানুরাগী সকলকেই আমরা আমন্ত্রণ করিতেছি।

আমারা সকলের ঠিকানা অবগত নহি। সুতরাং আমরা সকলকে ব্যক্তিগতভাবে আমন্ত্রণ করিবার সুযোগ পাইব না। তাই সাধারণভাবে বঙ্গসাহিত্যের সেবক ও সুহৃৎ সকলকেই আমরা আমন্ত্রণ করিতেছি,—আসুন, ভাই ভাই সকলে একপ্রাণ একমন হইয়া মায়ের মন্দিরে অঞ্জলি দানের জন্য উপস্থিত হউন।

সম্মিলনের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়ার ব্যবস্থা যথাশক্তি করা হইতেছে। সম্মিলনের অধিবেশন জন্য হাওড়ার ময়দানে প্রকাণ্ড এক

মণ্ডপ প্রস্তুতের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে; আর, সে মণ্ডপ বেষ্টন করিয়া, তাহার চতুষ্পার্শ্বে সাহিত্য ইতিহাস বিজ্ঞান কৃষি শিল্প প্রভৃতি বিষয়ক বিবিধসামগ্রীপূর্ণ প্রদর্শনী খুলিবার আয়োজন হইতেছে। মহিলাগণের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত আছে। প্রতিনিধিগণের বাসস্থানের জন্য হাওড়ার ষ্টেশনের উত্তরস্থিত প্রকাণ্ড ত্রিতল অট্টালিকা স্থির করা হইয়াছে।

যে সকল সাহিত্যসেবী এই সম্মিলনে যোগদান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সত্বর আমাকে পত্র লিখিয়া বিস্তারিত বিবরণ অবগত হউন।

উন্মাদের আত্মকথা।

ছুটে যাই পুনঃ চাই, ফিরায়ে বদন
পায়ে পায়ে পিছু হেঁটে, পুনঃ হেথা আসি ছুটে
আবার,—আবার হই, বিভ্রমে মগন।
দারুণ মোহেতে মজি, আপনি বন্ধন সৃজি
শৃঙ্খলিত করি নিজ কর ও চরণ
ভুলে যাই, আত্মলক্ষ্য—আপন সাধন!

ছেয়ে আসে কুজ্ঝটিকা চরাচর ছেয়ে
জাগে শঙ্কা কোলাহল, জ্বালা ভরা হলাহল
ঝালাপালা করে প্রাণ, উদ্বেগ বিস্ময়ে—
ঐ কে কোথায় ডাকে, অন্ধকারে মুখ ঢাকে
ওকি বলে ওকি চাহে, মরি সদা ভয়ে,
অশান্তি বিদ্যুৎ অগ্নি, জ্বলসে হৃদয়ে!—

"হবে না, হোল না কিছু" একি বিড়ম্বন?
ইচ্ছা মাঝে শক্তি নাই, ভয়ে ভীত সদা তাই,
শিখিয়াছি অসন্তোষে নারীর রোদন!

সতত অবজ্ঞা ভরে, সবাই শুনায় মোরে
আমার যা কিছু শক্তি বৃথা আস্ফালন!
অর্থহীন, ভিত্তিহীন, আকাশ কুসুম!

* * *

তোমরা কাজের লোক কাজ কর ভাই,
আমার আঁধার কোণে, আমি আছি নিজ ধ্যানে
তোমরা কোরনা দৃষ্টি যোড় হাতে চাই!
দর্পিতের পদ ভরে আমার এ খেলা ঘরে
বাধে যে বিপ্লব কত সংখ্যা তার নাই
অন্তরে আতঙ্ক ত্রাসে, কেঁদে মরি তাই!

সংসারে কাজের লোক আছে নিজ কাজে—
আমি আছি নিজ ধ্যানে, লাঞ্ছনা আহত প্রাণে
অতীত ভবিষ্য ভুলি অলক্ষ্যের মাঝে!
বর্ত্তমানে ভাবিবার, শক্তি নাই প্রাণে আর
তাইত চলেছি—দীন আত্মহারা সাজে
খুঁজিতে অন্তর অন্তে—আত্মোত্তর রাজে!

নারী

অজ্ঞানের অন্ধকারে কতকাল ঘুমাইয়া রব?
বিষাদের মহাগাথা নিরজনে কতদিন গাব?
শত অপমান সহি পড়ে রহি প্রাচীরের তলে;
পুরুষের কঠিন চরণ ধরণীতে পড়ে অবহেলে।
নারীর কোমল দেহ ততোধিক কোমল চরণ,
কণ্টক বিঁধিবে ভয়ে চিররুদ্ধ রহে আমরণ।
হায় মূর্খ! কাঁটা হেরি পুষ্পবনে করনা ভ্রমণ!
কণ্টক বাছিয়া কভু কমল কি করনা চয়ন?
সমাজের শত কাঁটা সবে মিলি দূর কর যদি,—
আঁধারের অবরোধ রহিবে না তবে নিরবধি।

শ্রীঅমিয়া গুপ্তা।

৺কৃষ্ণভাবিনী দাস।

অবতারণা

যে আদর্শ-নির্ম্মলচরিত্রা রমণী আমাদের এই বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া, স্বভাবসিদ্ধ সরল ধর্ম্মপ্রাণে অনুপ্রাণিত ও স্বগৃহ এবং স্বদেশীয় নারীকুলের শিরোমণি হইয়া, ধীর ও সহিষ্ণু ভাবে জীবনের প্রতিকূল অবস্থায় দুঃখ-বেদনা-বহন-পূর্ব্বক ভগবচ্চরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন, যিনি স্বদেশ ও স্বজাতির উন্নতি-কল্পে রত থাকিয়া, নিজ বিগত-দিনের উচ্চ-বংশানুগত পদমর্য্যাদা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যশঃস্পৃহা বিস্মৃতির অগাধ জলে বিসর্জ্জন দিয়া দেশ-সেবাব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, যাঁহার মনোবেদনার অংশ চিরদিন আমার মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে, তাঁহারই পবিত্র নিষ্ঠাময়-প্রকৃতি ও কার্য্যের কথা সংক্ষেপে কিয়দংশ জ্ঞাপন করিতে অভিলাষিণী হইয়া প্রিয় বামাবোধিনীর পাঠিকা, আমাদের স্নেহের কন্যা ও ভগ্নীগণকে উপহার দিতেছি।

শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী যখন জীবিতা ছিলেন, তখন এই জীবনী লিখিয়া তাঁহাকে দেখিয়া সংশোধন করিয়া দিবার জন্য পাঠাই। তাহাতে তিনি যে পত্রখানি আমাকে লিখেন, তাহা এতৎ সহ প্রকাশিত করিলাম। পাঠিকাগণ এই পত্রখানি পাঠ করিলেই দেবী কৃষ্ণভাবিনীর মহৎ জীবনের প্রকৃত পরিচয় পাইবেন।

আজ কৃষ্ণভাবিনী আর ইহলোকে নাই। তাঁহারই কথামত আমি সাধারণের সমক্ষে এই জীবনাদর্শ প্রকাশিত করিয়া কৃতার্থ হই।

কৃষ্ণভাবিনীর পত্র :— "প্রিয়-ভগিনি!

আমার মাপ করিবে। আমি এ খাতা পড়িতে বা ইহাতে কিছুই লিখিতে পারিব না। তোমরা আমায় অত্যন্ত ভালবাস জানি এবং সেই অযাচিত স্নেহের জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া থাকি। কিন্তু ভাই! তোমার পায়ে পড়ি, আমায় নির্জ্জনে নীরবে খাটিতে দাও, সাধারণের সমক্ষে আমার এ ক্ষুদ্র জীবনের ঘটনা প্রকাশ করিও না, আমায় মৃত্যুর পর যদি তুমি বাঁচিয়া থাক তখন প্রকাশ করিতে পার। এখনও সময় আসে নি। ভাই! কিছু মনে কোরো না। তোমার স্নেহ ভাবিয়া আমার চোকে বাস্তবিক জল পড়িতেছে, কিন্তু কেহ যেন টের না পায়, তুমি উহা লিখেছ। আমায় বড় লজ্জা করবে। আগামী কাল ৫টার সময় আমাদের বাড়ীতে শিক্ষয়িত্রী-সম্মিলনী হবে, তুমি যদি আসিতে পার ত জানাবে, গাড়ী পাঠাব। ভালবাসা লও।

তোমার অভিন্নহৃদয়া বন্ধু
কৃষ্ণভাবিনী"

কৈশোর জীবন।

যখন আমার বয়স ১৫।১৬ বৎসর, তখন কলিকাতায় আমার প্রথমা কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবার পরও ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিস্তার পাই নাই। আমার পূজনীয় শ্বশুরমহাশয়, শাশুড়ী-ঠাকুরাণী, স্বামী, ননন্দগণ সকলেই আমার জন্য ভাবিত। আমার পিতৃব্য-সম নন্দাই যিনি আমার পিতার পরম বন্ধু ও যিনি আমাকে শ্বশুরালয়ের একমাত্র-পুত্র-বধূরূপে নির্ব্বাচিত করিয়া আনিয়াছিলেন, সেই ডাক্তার-মহাশয়ের যত্ন-চিকিৎসা সত্ত্বেও

মাঝে মাঝে অসুখে পড়ি। একদিন আমার অল্প জ্বর আছে, সূতিকা গৃহে ৭।৮ দিনের কন্যা লইয়া শয়ন করিয়া আছি, দেখিলাম, আমার কনিষ্ঠা ননদিনীর ননদিনী, কলিকাতার কোন খ্যাতনামা ধনাঢ্যের পত্নী, বধূকন্যা-সহ তাঁহার ভাতৃজায়া-সমীপে আগমন করিলেন, (বোধ হয় আমার শ্বশ্রূমাতা বা ননদিনীর সাদর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে)। বধূটীর সেই কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলের সুকোমল রূপলাবণ্য, সেই অনিন্দ্য মাধুর্য্যময়ী সরলতা-মণ্ডিত মুখখানির প্রথম দর্শনেই আমি মুগ্ধ হইলাম। আমার মাতৃসমা ননদিনীঠাকুরাণীর নিকট অনেক বার ইহার গুণের কথা শুনিয়াছি। ইহার স্বামীর বিলাত-গমনের বিষয় ও তজ্জনিত ইহার বিলাস-বাসনা-বর্জ্জিত হইয়া অবস্থানের কথা কত প্রশংসার সহিত ননদিনীকে বারংবার কহিতে শুনিয়া পূর্ব্বেই ইহার অনেক পরিচয় পাইয়াছিলাম ও মাঝে মাঝে ইহাকে দেখিবার জন্য বলবতী ইচ্ছাও হইত। এক্ষণে চাক্ষুষ দর্শনে আমার অসুস্থতার মধ্যেও প্রফুল্লতা দেখা দিল, কিন্তু শরীর ভাল না থাকিলে সকলটাই পূর্ণরূপে আয়ত্ত হয় না, তাই তেমন উৎফুল্ল হইয়া তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে পারিলাম না। ইনি শ্রীনাথ দাসের চতুর্থ-পুত্রবধূ। ইঁহার ১ বৎসরের কন্যাটীকে মধ্যমা বধূ বসন্তকুমারীই স্নেহবশতঃ কাছে কাছে রাখেন। এ পর্য্যন্ত তাঁহার সন্তানাদি হয় নাই। ইনি একাই শ্বশ্রূমাতার সঙ্গে আসিয়াছেন, শাশুড়ী ইহাকে তিলার্দ্ধ চক্ষের অন্তরাল করিতে পারেন না।

সচরাচর বঙ্গগৃহে যেমন ননদ-ভাজ হইয়া থাকে, আমাদের সেরূপ নয়। প্রথমতঃ, আমার ননদগুলি আমার জননীরও বয়োজ্যেষ্ঠা; দ্বিতীয়তঃ, সকলে একমাত্র ভ্রাতাকে পুত্রবৎ দেখিতেন ও সেই কারণে আমাকে অতিরিক্ত আদর যত্ন করিতেন। কত যে আদর-যত্ন, তাহা যে কেহ দেখিয়াছেন, তিনি ছাড়া আর কেহ বুঝিবেন না। আমাকে কন্যা সম ভাবিলেও আদর করিয়া সকলে "বউদিদিই" বলিতেন ও যত কিছু আবদার আদরের সহিত শুনিতেন। আমি তাঁহাদের দিদি বলিয়া ডাকিয়াই তৃপ্ত হইতাম। যখন বধূটী আমার ঘরে প্রবেশ করিয়া আমার কন্যাটীকে সযত্নে বুকে তুলিয়া লইলেন, আমার যেন তাহাকে চির-পরিচিতের মতই বোধ হইল। সমস্তক্ষণ আমার কাছে থাকিয়া সেই চতুর্দ্দশবর্ষীয়া প্রবীণার ন্যায় স্থিরবুদ্ধি স্নিগ্ধমূর্ত্তি বালিকা অতিসংক্ষেপ সরল ও অল্পভাষে যে কয়টি কথা আমার সহিত কহিলেন, তাহা যেন অমৃতময় লাগিল। তখন ছোটদিদি বলিলেন, "বউদিদি! এই ন' বউমার কথা বলে বলে তোমার কাছে পুরণো করে দিয়েছি।" তাঁহাকে তিনি বলিলেন, "ন'বউমার মেয়ে ফেলে এসে বুঝি মন কেমন কচ্ছে, তাই আঁতুড়ে গিয়ে আমার ভাইঝি কোলে করে এতক্ষণ বসে আছ?" বধূ কিছু বলিলেন না; এমন একটী সরল ঈষৎ হাস্যরেখা তাঁহার মুখে ফুটিয়া উঠিল, যে তাহা এখনও আমার মনে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। মনে মনে ভাবিলাম, বিষণ্ণ অন্তরের মুখ ত গম্ভীরই দেখায়; এত তাহা নয়! বিষণ্ণভাবের ছায়াযুক্ত প্রফুল্ল ধীর স্থির মুখখানি! তখন তাহা পবিত্র স্বভাবের স্বর্গীয় শোভা বলিয়া উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই নাই। যাহা হউক, সে-দিনকার সামান্য

স্নেহে আমার আরামে কাটিল। একত আঁতুড়ে একা থাকিতে হইল না, তাহাতে কথা কহিবার লোক পাইলাম। বাটীতে অন্যসমবয়স্কা কেহ ছিল না, ছোটদিদি সংসার দেখেন, শ্বশ্রূমাতা প্রাচীনা, (আপন কক্ষেই প্রায় পড়িয়া থাকেন। শরীরও তাঁর অসুস্থ); সুতরাং সকল দিন চুপ্‌টী করিয়াই আমার কাটে। যাহা হউক্, ঝির হাত হইতে আমার কন্যাটীকে সমস্ত দিন সযত্নে রাখিয়া, সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাড়ী যাইবার জন্য বিদায় লইয়া যখন তিনি চলিয়া গেলেন, তখন সমস্ত দিনের উপকার আমি যেন ভুলিতে পারিলাম না। কিন্তু আমি এমনই বর্ব্বর ছিলাম যে, তাহার যাইবার সময় তাঁহাকে একটুও কৃতজ্ঞতা জানাইলাম না। সেই সরল মুখখানি যেন আমার চিরদিনের প্রাণের বন্ধু বাল্য-সঙ্গিনী ভগ্নী কাত্যায়নীর মতই লাগিল, এবং তাহার মতই আপনার লোক বলিয়া ভালবাসিতে ইচ্ছা হইল। মানুষ জগতে কত লোকের সহিত পরিচিত হয়, কিন্তু কাহাকে কাহকে হৃদয় এত নিকটবর্ত্তী করিতে চায় কেন, আর হৃদয়ের আদান-প্রদানে এত তৃপ্তই বা হয় কেন? ইহা বুঝিতে পারা কঠিন। অবশ্য স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে প্রকৃতিগত ঐক্য বা একমত কি একধর্ম্ম হইলে বন্ধুত্ব জন্মে, কিন্তু এস্থলে তাহা কিছুই নয়, এ যেন সেই রামে-সুগ্রীবে মিত্রতা, আমার মনে হইল। কৃষ্ণভাবিনী ও কাত্যায়নীর প্রকৃতির সরলতা ও ধীরতা একই প্রকার। আমার তদ্বিপরীত। কিন্তু দুজনেই আমাকে কেন এত ভালবাসার চক্ষে দেখিল, জানি না। বিবাহের অল্পকাল পরেই কাত্যায়নীসহ বিচ্ছিন্ন; মনে হইল কিশোরী যেন সে-অভাব দূর করিতে আবির্ভূতা হইলেন। কৃষ্ণভাবিনী আমার অন্তরের মমতা আকর্ষণ করিলে, ছোটদিদির কাছে তাঁহার সব বিষয় শুনিবার আগ্রহ বাড়িল। ইহার পরই কৃষ্ণভাবিনীদিগের পরিবারের একটী দুর্ঘটনায় তাঁহার আত্মবিস্মৃত হইয়া সেবার কথায় তাঁহার উপর শ্রদ্ধা আরও দ্বিগুণ হইল।

রোগীর শুশ্রূষা।

কৃষ্ণভাবিনীর শ্বশুর মহাশয় শ্রীনাথ দাসের ৫টী পুত্রও ৪টী কন্যা। পুত্র-উপেন্দ্র, জ্ঞানেন্দ্র, সুরেন্দ্র, দেবেন্দ্র, ও যোগেন্দ্র। জ্যেষ্ঠ উপেন্দ্র পত্নীবিয়োগান্তে বিলাত যাত্রার পর হইতেই স্বতন্ত্র। তাঁহার একমাত্র পুত্র পিতামহ-পিতামহীরও বড় আদরের ধন। মাতৃহীন বালককে সকলেই প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান করিতেন। সেই বালক যখন দীর্ঘকাল লিভারের অ্যাব্‌শেস্-রোগ ভোগ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল, কৃষ্ণভাবিনী নিজ-কন্যাকে বসন্তকুমারীর কাছে সমর্পণ করিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রাণ-ঢালা যত্নেও তাহাকে বাঁচাইতে না পারিয়া পুত্রশোক-তুল্য বোধ করিলেন। পরিবারের সকলেই নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। পিতামহী শোকে অধীর হইলেন। ছোট-দিদির মুখে যখন এ-সকল শুনিলাম, কৃষ্ণভাবিনীর এ-বয়সে এত সহিষ্ণুতা ও সেবাপরায়ণতার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। কৃষ্ণভাবিনী ছায়ার মত শ্বশ্রূমাতার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া, দিবাভাগে গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত রহিয়া সন্ধ্যাকালে ইষ্টদেব-স্মরণান্তে কন্যাটীকে বুকে লইয়া স্বামীর অপরিসীম প্রেম-কাহিনী ভাবিতে ভাবিতে যে-দিন নিদ্রাভিভূত হইতেন, স্বপ্নেও সেই পতিদেবতার মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেন; আবার যে-রাত্রে স্বামীকে পত্র লিখিতে বসিতেন, সে রাত্রি নিদ্রা তাঁহার নিকট বিদায় লইত। দিবাভাগে কন্যা তিলোত্তমা বসন্তকুমারীর নিকট ও জ্ঞানেন্দ্রের চক্ষু সম্মুখে দাস-দাসীর কাছে থাকিত, সন্ধ্যাকালে তাহাকে বক্ষে ধরিতে তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইত।

ইহার কিছুদিন পরে একদিন আমি কন্যাসহ নিজ কক্ষে বসিয়া আছি, এরূপ সময় একখানি পত্র পাইয়া পড়িলাম—"প্রিয় ভগিনি, তোমাকে দেখিয়া অবধি সর্ব্বদা মন তোমার কাছে ছুটিয়া যায়। এত দূরে থাকিয়া ইচ্ছামত দেখা সাক্ষাৎ অসম্ভব। পত্র-দ্বারা আলাপ চলিলে সে-অভাব কিয়ৎপরিমাণে দূর হইতে পারে।

দর্শনাকাঙ্ক্ষিণী ভগ্নী কৃষ্ণভাবিনী।

আমি এ-পর্য্যন্ত তাঁহাকে নাম জিজ্ঞাসা করি নাই। তবে কোনোদিন ছোটদিদি হয়ত বলিয়া থাকিবেন, তাঁদের ন'বউএর নাম কৃষ্ণভাবিনী। তাই আন্দাজে বুঝিলাম, নতুবা আর ত এরূপ কেহ লিখিবার নাই। এক কাত্যায়নী! এতো তাঁর হস্তাক্ষরও নয়, সে এ পত্রও নয়। অবশেষে ছোটদিদির কথাই মনে করিয়া তাহার ন'বউয়ের নামই কৃষ্ণভাবিনী স্থির করিয়া পত্রোত্তর দিলাম। এবার কৃষ্ণভাবিনীর সুদীর্ঘ পত্রোত্তর পাইয়া পুলকে পূর্ণ হইলাম, সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণভাবিনীর মুখখানি, তাহার গুণের কথা, পতিবিরহিত গৃহে অবস্থানের কথা, গুরুজনে ভক্তি, ধর্ম্ম-ভাব, জ্ঞান-চর্চ্চা, সমস্ত ভাবিয়া তাহার প্রতি শ্রদ্ধা-ভালবাসার উদ্রেকে আপনাকে কত হেয় মনে হইতে লাগিল, এবং এমন অযোগ্যকে বন্ধু বলিয়া প্রীতির চক্ষে দেখিয়াছে, ভাবিয়া আমার আরও গৌরব বোধ হইতে লাগিল।

পরদিন কৃষ্ণভাবিনীকে প্রাণ খুলিয়া পত্রোত্তর দিলাম। এইরূপে কত শত পত্রের আদান-প্রদানে কৃষ্ণভাবিনী আমার নিকট হইতেও নিকটতর অন্তরঙ্গ বন্ধু হইলেন। মধ্যে মধ্যে মাঘোৎসব উপলক্ষ্যে কলিকাতা আসিলে কয়েক দণ্ড মাত্র দেখা হইত। তাহাতে উভয়েরই মনের সাধ মিটিত না। ইহার কিছুদিন পরে শুনিলাম রাধারাণী ও মাতৃসমা শ্বশ্রূমাতার লোকান্তর-গমনে কৃষ্ণভাবিনী শোকার্ত্তা হইয়াছেন। কৃষ্ণভাবিনী সমস্ত দিন শাশুড়ী ছাড়া থাকিতেন না, শাশুড়ীও বধূকে এক দণ্ড ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। তাঁহার মৃত্যু-শয্যায় কৃষ্ণভাবিনী প্রাণপণে শাশুড়ীর সেবা শুশ্রূষা করিয়া চিকিৎসক হইতে দাস-দাসীকে অবধি আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছিলেন। ছোটদিদির মুখে সে সব শুনিলাম। পত্রেও কৃষ্ণভাবিনীর মর্ম্মবেদনা ব্যক্ত হইল। আমার কাছে তাহার আর কোন বিষয়ই গোপন নাই। যখন অবসরকালে কৃষ্ণভাবিনীর জীবনালেখ্য আমার স্মৃতি পথারূঢ় হইত, সে বিষাদের ঘন মেঘ যেন হাত দিয়াই সরাইতে ইচ্ছা হইত। কত দিনে তাহার স্বামী দেশে ফিরিয়া তাহাকে সুখী করিবেন, ইহাই ভাবিতাম। তাঁর শ্বশ্রূমাতার মনে পাছে ক্লেশ হয়, সেজন্য কৃষ্ণভাবিনীর পিত্রালয়ে যাওয়াও প্রায় ঘটিত না। তাঁহার মাতৃসন্নিধানে যাইতে সময় সময় প্রাণ ব্যাকুল হইত, ইচ্ছামত মাতৃ-দর্শন ঘটিত না। ভগ্নীগণ যাহারা কলিকাতায় থাকেন তাঁহারা মধ্যে মধ্যে লইয়া যাইতেন বা কোন ক্রিয়োপলক্ষে কৃষ্ণভাবিনীদের বাটীতে নিমন্ত্রণে আসিতেন, তাহাতেই দেখা-সাক্ষাৎ হইত। কর্ত্তব্যপরায়ণা কৃষ্ণভাবিনীর কিছুতে বিরক্তি বা অসন্তোষ নাই। শাশুড়ী বর্ত্তমানে তাঁহার আজ্ঞাধীনে সকল কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিতেন, সদাসর্ব্বদা বিবিধ কর্ম্মে সাহায্য করিয়া তাঁহাকে যারপর নাই সুখী ও সন্তুষ্ট করিতেন, দেবর, ননদ, আত্মীয়গণ দাস-দাসী পর্য্যন্ত সকলেরই এক দিনও ন'বউ বিনা চলে না। কৃষ্ণভাবিনীর জীবনের একটী মহাগুণ কর্ম্ম-তৎপরতা; ইহা-দ্বারা তিনি অল্প বয়স হইতেই মনের সকল দুঃখ, তাপ, গ্লানি হইতে চিত্তবেগ শান্ত রাখিতে পারিয়াছিলেন। চিন্তায় বাক্যে ও কার্য্যে ইনি সদাসর্ব্বদা একইরূপ শুদ্ধতা ও সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন; বয়স্যা-গণসহও ইহাকে কখনও বৃথা বাক্যব্যয় বা চটুল হাস্য-রহস্য, পরিহাস করিতে শোনা যায় নাই। সকলের সার মানব-হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটীই কৃষ্ণভাবিনীতে চিরদিন সমভাবে বর্ত্তমান দেখিয়াছি। সেটী ঈশ্বরে ঐকান্তিক বিশ্বাস ও নির্ভরতা, নিঃস্বার্থ অন্তঃকরণ ও সেবাপরায়ণতা। ইহা কৃষ্ণ-ভাবিনীর স্বভাবজাত গুণ। শিক্ষায়, চেষ্টায় কাহারও এত গুণ লাভ হয় বলিয়া আমি জানি না। (ক্রমশঃ)

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 668. April, 1919.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৬ বর্ষ। ৬৬৮ সংখ্যা। | চৈত্র ১৩২৫। এপ্রিল, ১৯১৯। | ১১শ কল্প। ৩য় ভাগ।

গানের স্বরলিপি।

মিশ্র—কাওয়ালী।

প্রভু তোমার সঙ্গীত ভেসে আসে
সুগন্ধ মলয়জ পবনে ;
তোমার সঙ্গীত ভেসে আসে
এই নিমেষ-হারা নীল গগনে !
তোমার সঙ্গীত ভেসে আসে
রবি-তারা-চন্দ্রমা-কিরণে,
সকাল সাঁঝের অরুণাকাশের
ঝর ঝর নির্ঝর ছিরণে !
প্রভু তোমার সঙ্গীত ভেসে আসে
এই কূজিত গুঞ্জিত কুঞ্জ-বনে ;
প্রভু তোমার সঙ্গীত ভেসে আসে
এই ফল-ফুল-পূজিত কাননে !
প্রভু তোমার সঙ্গীত ভেসে আসে
মম বিজন মানস-উপবনে,
শিহরিয়া বাঁশী বাজে মরমে
ভাষাহীন মধু-কল-স্বননে।

কথা ও সুর—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি, এল্। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা

[গগা]
সসা

II সা সা -পা পা । পা -া পা পা । পা পা পা -ধা ।
তো মা • র স ঙ্ গী ত ভে সে আ •

। পা -া -া -মা I মা মা -া মা । গা রা সা সা ।
সে • • • সু গ ন্ ধ ম ল য় জ

। সা রমা গা সসা । সা সা -া সা I সা -া সা সা ।
প ব• নে প্রভু তো মা • র স ঙ্ গী ত

। সা সা সা -রা । রসনা -া সসা মা । মা মা মা গরা I
ভে সে আ • সে•• • এই নি মে ষ হা রা•

I সসা সা রসা গা । পা পা -া না । না -া না না ।
নীল গ গ• নে তো মা • র স ঙ্ গী ত

। না না না -া I র্সা পা -া -া । পা পা পা পা ।
ভে সে আ • সে • • • র বি তা রা

। মা -া গা রসা । সা রমা গা সসা I গা পা পা পা ।
চ ন্ দ্র মা• কি র• ণে প্রভু স কা ল সাঁ

। পা -া -া পনা । ধা ধা পা পা । ধা পা -া -া I
ঝে • • র• অ রু ণা কা শে • • র

I মা মা মা মা । গাঃ গঃ সা সা । সা রা -মা গা ।
ঝ র ঝ র নি র্ ঝ র ছি র • ণে

। -া -া -া গগা II
• • • প্রভু

২´ ৩ ০
পপ্ II পা পা -া সা । সা -া সা সা । সা সা সরা -রা ।
প্রভু তো মা ০ র স ঙ্ গী ত ভে সে আ০ ০

১ ২´ ৩
। রা -া -া সসা I সা -মা মা মা । মা -া মা মা ।
সে ০ ০ এই কু ০ জি ত ও ঞ্ জি ত

০ ১ ২´
। গা মা গা রা । গ -া -া গগা I গা গপা -া পা ।
কু ঞ্ জ ব নে ০ ০ প্রভু তো মা০ ০ র

৩ ০ ১
। পা -া পা পা । পা পা পধা -া । পা -মা -া মমা I
স ঙ্ গী ত ভে সে আ০ ০ সে ০ ০ (এই)

২´ ৩ ০
I মা মা মা মা । গা -রা সা সা । সা -া -রমা -া ।
ফ ল ফু ল পূ ০ জি ত কা ০ ন০ ০

১ ২´ ৩
। গা -া -া গগা I পা পা -া না । না -া না না ।
নে ০ ০ প্রভু তো মা ০ র স ঙ্ গী ত

০ ১ ২´
। না না না -র্সা । র্সা -পা -া পপা I পা -া পা পা ।
ভে সে আ ০ সে ০ ০ মম বি ০ জ ন

৩ ০ ১
। মা -া মা মা । গা -মা গা রা । গা -া -া -া I
মা ০ ন স উ ০ প ব নে ০ ০ ০

১´ ৩ ০
I গা গপা পা পা । পা পা পা পনা । ধা -া পা -া ।
শি হ০ রি য়া বা শী বা জে০ ম ০ র ০

১ ২ ৩
। ধা -পা -া -া । মা মা মা -া । গা রা সা সা।
মে ০ ০ ০ ভা যা হী ন ম ধু ক ল

০ ১
। সা -া রমা -া । গা -া -া সসা II
স্ব ০ ন০ ০ নে ০ ০ প্রভু

অষ্টাবক্রগীতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ষোড়শ প্রকরণ।

আচক্ষ্ব শৃণু বা তাত নানাশাস্ত্রাণ্যনেকশঃ।
তথাপি ন তব স্বাস্থ্যং সর্ব্ববিস্মরণাদৃতে ॥১॥

হে শিষ্য, যদ্যপি তুমি নানাশাস্ত্র বহুবার ব্যাখ্যা কর অথবা শ্রবণ কর, তথাপি সকল-ভেদ-বিস্মরণ করা ব্যতিরেকে, তুমি (স্বরূপ-লাভ বা মুক্তিরূপ) স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারিবে না। ১।

ভোগং কর্ম্ম সমাধিং বা কুরু বিজ্ঞ তথাপি তে।
চিত্তং নিরস্তসর্ব্বাশমত্যর্থং রোচয়িষ্যতি ॥২॥

হে শিষ্য, তুমি জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া বিষয়-ভোগ কর, অথবা সকামকর্ম্ম কর অথবা সমাধির অনুষ্ঠান কর, তথাপি তোমার চিত্ত সর্ব্বপ্রকার বাসনারহিত আত্মস্বরূপেই অধিক রুচি জন্মাইবে। ২।

আয়াসাৎ সকলো দুঃখী নৈনং জানাতি কশ্চন।
অনেনৈবোপদেশেন ধন্যঃ প্রাপ্নোতি
নির্বৃতিম্ ॥ ৩॥

বিষয়ের জন্য পরিশ্রম করিয়াই সকলে দুঃখী হয়, কিন্তু কেহই ইহা বুঝে না; ভাগ্যবান্ পুরুষ এই উপদেশ পাইয়াই (বিষয় ত্যাগপূর্ব্বক) পরমসুখ প্রাপ্ত হ'ন্।

ব্যাপারে খিদ্যতে যস্তু নিমেষোন্মেষয়োরপি।
তস্যালস্যধুরীণস্য সুখং নান্যস্য কস্যচিৎ ॥ ৪ ॥

যে পুরুষ নেত্রের নিমেষ-ও উন্মেষ-ব্যাপারেও পরিশ্রম মনে করিয়া দুঃখিত হয়, সেই পরম আলস্যসম্পন্ন (অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়) ব্যক্তিরই সুখ হয়, অন্য কাহারও সেই সুখ হয় না। ৪।

ইদং কৃতমিদং নেতি দ্বন্দ্বৈর্মুক্তং যদা মনঃ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু নিরপেক্ষং তদা ভবেৎ ॥৫॥

'ইহা করা উচিত', 'ইহা করা উচিত নহে', এই প্রকার বিধি-নিষেধরূপ দ্বন্দ্ব হইতে যাঁহার মন মুক্ত হইয়াছে, তিনি ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ, সর্ব্ববিষয়েই নিরপেক্ষ হ'ন্, অর্থাৎ জীবন্মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হ'ন্। ৫।

বিরক্তো বিষয়দ্বেষ্টা রাগী বিষয়লোলুপঃ।
গ্রহমোক্ষবিহীনস্তু ন বিরক্তো ন রাগবান্ ॥ ৬ ॥

যে বিষয়ে দ্বেষ-প্রদর্শন করে, তাহাকে বিরক্ত বলে; যে বিষয়ে লোলুপ হয়, তাহাকে রাগী বলে। কিন্তু গ্রহণ ও ত্যাগ এই উভয়-বর্জ্জিত জ্ঞানী বিষয়ে দ্বেষ-প্রদর্শনও করেন্ না, বিষয়ে লোলুপও হ'ন্ না। ৬।

হেয়োপাদেয়তা তাবৎ সংসারবিটপাঙ্কুরঃ।
স্পৃহা জীবতি যাবদ্বৈ নির্বিচারদশাস্পদম্ ॥ ৭ ॥

অজ্ঞান-দশার নিবাসরূপ তৃষ্ণা যতক্ষণ পর্য্যন্ত থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্তই সংসারতরুর মূলস্বরূপ ভাল মন্দ জ্ঞান বর্ত্তমান থাকে। ৭।

প্রবৃত্তৌ জায়তে রাগো নিবৃত্তৌ দ্বেষ এব হি।
নির্দ্বন্দ্বো বালবদ্ধীমান্ এবমেব ব্যবস্থিতঃ ॥ ৮ ॥

যদি বিষয়ে প্রবৃত্তিসম্পন্ন হওয়া যায়, তবে দিন দিন তাহাতে আসক্তি বৃদ্ধি পায়, যদি বিষয় হইতে নিবৃত্ত হওয়া যায়, তবে ক্রমশঃ তাহাতে বিদ্বেষ জন্মে; এ-কারণ জ্ঞানী শুভাশুভবিচার-রহিত বালকের ন্যায় রাগদ্বেষ-ত্যাগপূর্ব্বক আসক্তির সহিত বিষয়ভোগ ও বিদ্বেষের সহিত বিষয়ত্যাগ, এই উভয়ই বর্জ্জন করিয়া প্রারব্ধকর্ম্মানুসারে যাহা প্রাপ্ত হ'ন্, তাহাতেই প্রবৃত্ত হ'ন্ ও যাহা প্রাপ্ত হ'ন্ না, তাহার জন্য কোন প্রকার ইচ্ছা করেন্ না ॥৮॥

হাতুমিচ্ছতি সংসারং রাগী দুঃখজিহাসয়া।
বীতরাগোহি নির্মুক্তস্তস্মিন্নপি ন খিদ্যতে ॥ ৯ ॥

বিষয়াসক্ত পুরুষ (অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করিয়া) দুঃখ দূর করিবার মানসে সংসার ত্যাগ করিবার ইচ্ছা করে, বীতরাগ পুরুষ স্বভাবতই নির্মুক্ত; একারণ তিনি সংসারে থাকিলেও তিনি দুঃখ প্রাপ্ত হ'ন্ না। ৯।

যস্যাভিমানো মোক্ষেঽপি দেহেঽপি মমতা তথা।
ন চ জ্ঞানী ন বা যোগী কেবলং দুঃখ-
ভাগসৌ ॥ ১০ ॥

যাহার 'মোক্ষ হউক্', এইরূপ অভিলাষ আছে, আবার দেহের প্রতিও মমতা আছে, সে জ্ঞানীও নহে, যোগীও নহে; কেবল (উভয় প্রকার চেষ্টার জন্য) দুঃখই সে প্রাপ্ত হয়। ১০।

হরৌ যদ্যপদেষ্টা তে হরিঃ কমলজোঽপি বা।
তথাপি ন তব স্বাস্থ্যং সর্ববিস্মরণাদৃতে ॥ ১১ ॥

হে শিষ্য, যদি সাক্ষাৎ সদাশিব, অথবা বিষ্ণু অথবা ব্রহ্মা তোমার উপদেষ্টা হ'ন্, তথাপি সকল ভেদ-বিস্মরণ করা ব্যতিরেকে অথবা সকল অনিত্য, প্রাকৃত বস্তু বিস্মরণ করা ব্যতিরেকে, তুমি কিছুতেই (স্বরূপলাভ বা মুক্তিরূপ) স্বাস্থ্যলাভ করিতে পরিবে না। ১১।

ইতি অষ্টাবক্রগীতার বিশেষোপদেশ-নামক
ষোড়শ প্রকরণ সমাপ্ত।

শ্রীধীরেশচন্দ্র শাস্ত্রী।

বাঞ্ছিতে।

কেন হে দূরে?
জীবনে খুঁজিয়া তোমা
মরিনু ঘুরে!
কত লোকে কত কয়
প্রাণে আর কত সয়?
এস ওহে দয়াময়!
দীন আতুরে—
আপনা করিয়া লহ
আপন সুরে!

যদি নাহি দিবে সুর
পরাণ-মাঝে,
কেন তবে এ ভুবন
নূতন সাজে?—
কেন তবে বয়ে যায়
আকুলি' মধুর বায়,
হেরি হেম চাঁদিমায়
নয়ন ঝুরে?
কেন হে দূরে?

শ্রীসুখেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

ঔপন্যাসিকের বিপদ্।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৩

পার্শ্বের ঘরে জলযোগের বিপুল আয়োজন হইয়াছিল। ছাঁটা গোঁফের কোমল আসনের উপর দাঁড়াইয়া ব্রজেন্দ্রনাথ বিস্মিতভাবে কহিলেন, "এ সব কি ব্যাপার বল দেখি!—এ বুষোৎসর্গ-ব্যাপার যে? তোমার বেয়ারার কাছে শুন্‌লুম, বাড়ীতে কেবল মেম-সাহেব ও সাহেব ছাড়া দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি থাকেন না। সাহেব ত' আবার নিমন্ত্রিত।—তবে স্বহস্তে এ রাজভোগের বন্দোবস্ত করেছ কা'র জন্যে? মুখুজ্জে-ম'শায়ের তার কি তাড়িত-বার্ত্তায় মনের মধ্যেও এসে পৌঁছেছিল না-কি?" অণিমা গ্লাসের জল বদ্‌লাইয়া বাতীর আলো আর একটু কাছে আগাইয়া দিয়া আস্তে আস্তে কহিল, "বসুক আপনি! সারাদিনের পরিশ্রম আমার সার্থক্ হোক্।" এই বলিয়া সে মুখ ফিরাইয়া তোলা উনুনে ঘিয়ের কড়া চাপাইয়া দিয়া নতমুখে আগুনের তেজ বাড়াইবার জন্য পাখার বাতাস দিতে সুরু করিল। তাহার বাষ্প-জড়িত কণ্ঠস্বর ও চোখের পাতার জলের রেখা ব্রজেন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়াইল না।

কিছুমাত্র ক্ষুধা-বোধ না হইলেও খাদ্য-দ্রব্যের অতিরিক্ত প্রশংসা করিয়া, রন্ধন-কারিণীর শুভ্র গণ্ডে গোলাপ ফুটাইয়া অত্যন্ত পেটুকের মত ব্রজেন্দ্রনাথ আহার শেষ করিলে, অণিমা পান আনিয়া দিল। পানের খিলিদুইটী মুখে পুরিয়া একখানা হাত অণিমার কাঁধের উপর রাখিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে ব্রজেন্দ্রনাথ বলিলেন, "অণি, আমার কথার সত্যি জবাব দেবে ভাই, যা জিজ্ঞাসা কর্‌বো?" "কেন দেব না; মুখুজ্জে ম'শাই?" বলিয়া ব্রজেন্দ্রের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির লক্ষ্য হইতে নিজের দৃষ্টি ফিরাইয়া অণিমা একদিকে চাহিয়া রহিল। ব্রজেন্দ্রনাথ কণ্ঠস্বর মৃদু করিয়া কহিলেন, "তবে বল দেখি, তুমি সত্য সত্যই সুখী কি না?" অণিমা মুখ না ফিরাইয়াই কহিল, "আমায় দেখে তা কি মনে হয় না, মুখুজ্জো মশাই?"

পাতলা চুলে ঘন ঘন হস্ত সঞ্চালন করিয়া চিন্তিত মুখে ব্রজেন্দ্রনাথ কহিলেন, "হওয়া উচিত ছিল বৈ কি? খাসা গহনা-কাপড়,—দিব্যি বাড়ী-ঘর!—আহারের বন্দোবস্ত ত' রাজভোগ! তার উপর এমন স্বামী! কিন্তু তবু তোমার চোক্ বল্‌ছে 'ঝর্‌লুম্' 'ঝর্‌লুম্'!—আচ্ছা যদি সুখী নও—তবে কেন নও,—আমায় সব কথা খুলে বল দেখি! বার বছর আগে এই মুখুজ্জে-ম'শাইকে যেমন করে তোমার রাগ, দুঃখু, ঝগড়া-অভিমানের কথা বল্‌তে—নালিশ—শালিশী মান্‌তে—তেমনি করে বার বছর আগেকার সেই ছোট্ট অণিটী হয়ে তোমার মনের কথা একবার খুলে বল দেখি। তুমি যে একজন বাড়ীর গিন্নী, বুড় ধাড়ী, সে কথা একেবারে ভুলে যাও। সরলভাবে সত্যি কথাটী বল ত—লক্ষ্মি,—কোন কথা লুকিয়ো না;—লজ্জা না, কিছু না!—বল দেখি সত্যি সত্যিই তুমি সুখী কি-না?" অণিমার কম্পিত স্বেদসিক্ত হাত-

খানি নিজের হাতের মধ্যে রাখিয়া স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে ব্রজেন্দ্রনাথ পুনরায় কহিলেন, "বল, বল।"

এই স্নেহময় আত্মীয়ের সুগভীর স্নেহের স্পর্শে অণিমার দুঃখের জমাট-বাঁধা মেঘ সহসা অশ্রুর আকারে জল হইয়া ঝরিয়া পড়িল। মনের ব্যথা সে আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না; কাঁদিয়া কহিল, "আমায় নিয়ে চলুন, মুখুজ্যে-ম'শাই!—এখান থেকে আমায় নিয়ে চলুন! আমি এমন করে আর থাকতে পাচ্ছি না।" সান্ত্বনাচ্ছলে তাহার ললাটে মৃদু মৃদু অঙ্গুলীর আঘাত করিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ বলিলেন, "নিয়ে যেতেই ত' এসেছি তোমায়। কিন্তু আমার কথার জবাব কৈ? বল্লে না ত?—তুমি সুখী কিনা?" নীরবে মাথাটী হেলাইয়া অণিমা জানাইল সে সুখী। ব্রজেন্দ্র কহিলেন, "তবে কাঁদলে কেন?—ওঃ বাপের বাড়ী যেতে দেয় না, নাঃ? তাই ত! তা হ'লে কি ওখানেই যেতে দেবে?" অণিমা এবার বাধা দিয়া সবেগে বলিল, "সে বুঝি, আমার জন্যে?—সে তাঁর লেখার জন্যে। তাঁর ত আর দরকার নেই—।" ব্রজেন্দ্রনাথ মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "লেখার জন্যে কি রকম? তুমি কি তাঁর সেক্রেটারী না কি?"

"না মুখুজ্জে-ম'শাই, এমন করে শুধু ভাব-সংগ্রহের যন্ত্র হওয়, তাঁর উপন্যাসের মডেল হয়ে, আমি আর থাকতে পাচ্ছি না! আমি তাঁর স্ত্রী নই। আমায় তাঁর কোন দরকার নেই। কেন জানেন? গার্হস্থ্য জীবন লেখকের কল্পনায় ছাতা ধরিয়ে দেয় বলে।" ব্রজেন্দ্রনাথ একটা বড় রকম 'হুঁ' দিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিয়া কহিলেন, "কোথায় যাবে সে বেড়াতে?" অণিমা কহিল, "তা আমি জানি না;—বোধ হয়, কাশ্মিরং।" তদুত্তরে ব্রজেন্দ্র কহিলেন, "কিছু বলে নি তোমায়?—জিজ্ঞাসাও কর নি বুঝি?" "না, করি নি।—কবুবার দরকার আমার?" বলিয়া অণিমা অভিমানভরে একদিকে চাহিয়া রহিল। তাহার ঠোঁট-দুটী একটু একটু কাঁপিতেছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ এবার একটুখানি গম্ভীরভাবে কহিলেন, "দরকার আছে বৈ কি। আচ্ছা, স্বামি-স্ত্রীর চেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আর কিছু নেই ত? তবে সব চেয়ে যে আপনার, তার কোন কথা গোপন থাকা উচিত কি? সব কথা কি পরস্পরের কাছে বলা ভাল নয়? ঝগ্‌ড়া হয়েছে বুঝি?" অণিমা বলিল, "না, ঝগড়া আমাদের কখ্‌খনো হয় না।—" "হয় না!" বলিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ অণিমার বিষণ্ণ নতমুখের পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া দেখিয়া সন্দিগ্ধস্বরে বলিলেন, "এটা ত ভাল লক্ষণ নয়। স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে ঝগ্‌ড়া হয় না?—অ্যাঁ! আশ্চর্য্য করে দিলে যে! বিশেষতঃ তোমার সঙ্গে!—তুমি ত কোঁদলের একটী জাহাজ। আচ্ছা, আদিত্য যত্ন করে না তোমায়?" অণিমা চোখ নীচু রাখিয়াই উত্তর দিল, "করেন্।" যখন তাঁর 'কাপির' দরকার হয়। নৈলে মনেও পড়ে না—বাড়ীতে কেউ আছে বলে। তাঁর সময় এত কম দামী নয় যে, বাজে নষ্ট করেন্।" ব্রজেন্দ্রনাথ চিন্তিত মুখে দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিলেন,—"আমায় বিশ্বাস কর অণি, কাল যেমন ক'রে হ'ক্ তোমায় নিয়ে যাব; কিন্তু তার আগে তুমি ব'লে ক'য়ে ঠিক্ হ'য়ে থেক। অ্যাঁ, স্বামি-স্ত্রীর ভেতর ঝগ্‌ড়া হয় না?—অবাক্ করে

দিলে যে আমায়! তোমার দিদিকে গিয়ে এটা ত' বল্‌তেই হবে। এটা খুব ভাল বন্দবস্ত—অ্যাঁ—?"

৪

পরদিন বেলা দুইটা না বাজিতেই একখানা সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ীর মাথায় কিছু ফলমূল-জিনিষপত্র চাপাইয়া ব্রজেন্দ্রনাথ আসিয়া উপস্থিত হইলেন্। কলিকাতায় আসিবার সময় স্ত্রী বলিয়া দিয়াছিলেন, "অণু নিরুকে দেখিতে আসিবে, কিছু ভাল ফলমিষ্টি কিনিয়া আনিও।" নিজেরও কয়েকটি জিনিষ কিনিবার প্রয়োজন ছিল;—এক জোড়া জুতার ফরমাইস দিতে হইল। এই সব কাজে বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। বাড়ী ঢুকিয়াই খপর পাইলেন—সাহেব আহারান্তে বাহির হইয়াছেন; ফিরিবার সময়ের কথা চাকর-বাকরেরা জানে না। বিরক্ত হইয়া ব্রজেন্দ্রনাথ মনে করিলেন—"আজও তবে হয় ত যাওয়া হইল না। অথবা না যাইতে দিবারই ইহা ফন্দি! আচ্ছা, অভদ্র ত!"

উপরে উঠিতে আজ আর দ্বারবান্ বা বেহারা কাহাকেও কৈফিয়ৎ দিতে হইল না। কল্য তাহারা শুনিয়াছে, ইনি কর্ত্রীর আত্মীয়, আর কেহ কেহ দেখিয়াওছে যে, কর্ত্রী নিজে বসিয়া কত যত্নে ইহাকে খাওয়াইয়াছেন, পায়ের ধূলা লইয়া প্রণামও করিয়াছেন। তাই বিনা দ্বিধায় তাহারা পথ ছাড়িয়া দিল। সিঁড়ির মাথায় অণিমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল। পায়ের শব্দ পাইয়াই, বোধ হয়, সে ঘর হইতে বাহির হইয়াছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ চাহিয়া দেখিলেন, অণিমা একখানি মেঘলা-রং ঢাকাই সাড়ী ও সেই রংয়েরই একটী ব্লাউস পরিয়াছে; দুই-চারিখানি অলঙ্কারও যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ব্রজেন্দ্রনাথ একটুখানি ক্ষুণ্ণভাবে বলিলেন, "আদিত্যবাবু বেরিয়ে গেছেন, দেখা হ'লো না! বড় মুস্কিলেই পড়া গেল ত! তোমার যাবার কি হবে বলো ত? অনুমতি পেয়েছ না কি? যাবে তা হ'লে সত্যি সত্যিই?" অণিমা আঁচলের চাবি খুলিয়া রাখিয়া সোনার সেফ্‌টীপিন আঁটিতে আঁটিতে মুখ নীচু করিয়া দুষ্টামির হাসি হাসিয়া বলিল, "ভয় পাচ্ছেন্ বুঝি, মুখুজ্জে-ম'শাই!—ভাবছেন্, বোঝাটা ঘাড়ে পড়েই যায় বা?" ব্রজেন্দ্রনাথ কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যে মুখভার করিয়া কহিলেন "অয়ি প্রিয়ম্বদে! যদি অভয় দাও ত' বলি, এ বুড় ঘাড়ে বোঝা বইতে চাইলেই কি বোঝা এ ঘাড়ে থাক্‌তে রাজী হবে? না, তামাসা থাক্। তুমি ত' তৈরী দেখ্‌ছি। র‍্যাঙ্কেলটা বুঝি আধঘণ্টা দেরী কর্‌তে পাল্লে না? তা হ'লে যাবার কি-রকম হবে বল দেখি?" "কেন সোজা গিয়ে গাড়ীতে উঠব—আমার সব গুছনই আছে। চলুন না।" বলিয়া অণিমা অগ্রসর হইল দেখিয়া, ব্রজেন্দ্রনাথ আদিত্যনাথের সহিত সাক্ষাৎকার না হওয়ার জন্য নিজ-মনঃক্ষোভের সংবাদ পুনরায় মৃদুস্বরে প্রকাশ করিতে করিতে তাহার অনুবর্ত্তী হইলেন।

৫

ঘর অন্ধকার। দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া আদিত্য ডাকিল, "অণি!" ঝি আলো জ্বালিয়া দিলে আদিত্য বলিল, "এরা গেল কোথায়?" ঝি বলিল, "মা, সেই লম্বা হেন সুন্দর বাবুটীর সঙ্গে দুপুরবেলাই চলে গেছে!" আদিত্য বিস্মিতভাবে কহিল, "কার সঙ্গে!—

কোথায় গেছেন্?" চাঁপা ঝি বুদ্ধি খাটাইয়া বাবুকে নিশ্চিন্ত করিবার অভিপ্রায়ে কহিল, "সেই যে বাবুটী আসে,—হেসে হেসে কথা কয়,—মস্ত জোয়ান মানুষ, তেনার বাড়ীতেই গেছে, বোধ করি?" আদিত্য বিরক্তি-ভরে কহিল, "সঙ্গে কে গেল? কখন্ ফির্‌বে ব'লে গেছে?" চাঁপা বাবুর ভ্রুকুটীপূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া ভীত হইয়াছিল। সে ভয়ে ভয়ে কহিল,—"তা ত' কিছু বলে নি বাবু! আমি শুছুলুম্, আমায় যেতে হবে কি না?—মা বল্লে, 'না চাঁপা, তুই থাক্, বাড়ীঘর রইল। ঐ টেবুলের উপর কি চিঠি আর চাবী রেখে গেছে আপনার তরে।" কুঞ্চিত ললাটে ঊর্দ্ধমুখে আদিত্য ভাবিতে লাগিল—"কে সে লম্বা, জোয়ান ভদ্রলোক!—তাঁহাকে না জানাইয়াই তাঁহার অণি স্বেচ্ছায় যাঁহার সহিত স্বাধীনভাবে চলিয়া যাইতে পারে? তাঁহার বা অণিমার কোন আত্মীয় হইবেন্ কি? কে সে আত্মীয়টী? দাসী বলিয়াছে, যে বাবুটী আসেন্। তবে নূতন কেহ নয়। কিন্তু কে আসেন্? কোন পরিচিত এমন পরমাত্মীয়ের সংবাদ ত' কই স্মরণ হয় না! কিন্তু অণিমা চিঠি রাখিয়া গিয়াছে, না? চিঠিতে সে সব কথা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে; না বলিয়া হঠাৎ চলিয়া যাওয়ার জন্য নিশ্চয়ই তাহাকে ক্ষমা করিবার কথাও লিখিয়াছে। আদিত্য ভাবিয়া দেখিল, ক্ষমা ত করিতেই হইবে, কিন্তু সহজে নয়। এ কি অন্যায় কথা! ঘরে ঢুকিয়া প্রথমেই সে টেবিলের উপর হইতে চিঠিখানি তুলিয়া লইলেও তখনি পাঠ করিল না। খোলা জানালার ধারে দাঁড়াইয়া অন্ধকারের পানে চাহিয়া কিছুক্ষণ সে অণিমার আচরণের বিষয় ভাবিতে লাগিল। প্রথমে মনে হইল,—অণিমার এতখানি স্বেচ্ছাচারিতা অনুচিত; এজন্য সহজে তাহাকে ক্ষমা করা যায় না। সে যেমন না বলিয়া নিজের ইচ্ছামত চলিয়া গিয়াছে, আদিত্য তেমনি কোন সংবাদ না লইয়া অবহেলা দেখাইয়াই তাহাকে জব্দ করিবে। কিন্তু মিনিট দুই পরেই আদিত্য-নাথকে সংকল্প বদল করিতে হইল। সে ভাবিয়া দেখিল,—অণিমাকে ক্ষমা করাই ভাল। ছেলেমানুষ না বুঝিয়া একটা অন্যায় করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া তাহার কি আর মাপ নাই! বিশেষতঃ, সে যেরূপ অভিমানিনী, আদিত্যের কৃত্রিম অনাদর-প্রকাশে হয়ত কাঁদিয়া কাটিয়া মাথা খরাইয়া জ্বর করিয়া বসিবে! কাজ নাই, মাপ করাই ভাল। কিন্তু তৎপূর্ব্বে তাহার অন্যায়ের জন্য একটু কড়া ভাবে বুঝাইয়া দিতে হইবে। এইরূপে অণিমার ভবিষ্যৎ নির্ণীত হইয়া গেলে, আদিত্যনাথ অণিমার চিঠিখানি আলোর কাছে খুলিয়া মেলিয়া ধরিল। চিঠির সঙ্গে আর একখানি কাগজ ছিল, তাহাতে এই কয় লাইন লেখা—

"ভালবাসা স্নায়ুর বিকার, মনোবৃত্তির ক্ষণিক স্ফুরণ; সুচিকিৎসকের চিকিৎসায় সহজেই ইহা আরোগ্য-লাভ করে। ভালবাসা গুণবিশেষ। সময়-রৌদ্র ভালবাসারূপ রেসমী-সাড়ীর বর্ণ বিবর্ণ করিয়া তুলে।" এই মন্তব্যটুকুর সহিত আর একখানি কাগজে কোন সম্বোধন না করিয়া পত্রের মত লাইন কয়েক লেখা। তাহা এই—

আমি চলিলাম। আশা করি, বাড়ীতে

ও সঙ্গে স্ত্রী না থাকায় তুমিও আজ সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। তোমার পশ্চিম ভ্রমণ সুখকর হউক্। মস্তিষ্ক শীতল রাখা ও মনের শান্তিবিধানের কোন অন্তরায় বর্ত্তমান রহিল না। ভালবাসার সম্বন্ধে তোমার প্রাকৃতিক জ্ঞান উন্নত। তোমার কাছে এ-সকল উচ্চ বিষয়ে আলোচনার অযোগ্য, তাই যাহার নিকট যথার্থ ভালবাসা পাইয়াছি ও যাঁহাকে ভালবাসি তাঁহার সহিত চলিলাম্। নিতান্ত আবশ্যক দুই-একখানি কাপড়-গহনা ছাড়া সমস্তই যথাস্থানে রহিল। তোমার চেঞ্জে যাইবার ট্রাঙ্কও গুছাইয়া রাখিলাম। প্রণাম গ্রহণ করিবে। বিশ্বাস ক'রো, আমি তোমায় সমস্ত প্রাণ দিয়েই ভাল বাসতুম্ উপন্যাসের ; নায়িকা বা ঔপন্যাসিকের মত নয়।

—অণিমা—

চিঠি পড়িয়া আদিত্যকে অবলম্বনের জন্য জোর করিয়া টেবিলের উপর হাত রাখিতে হইল। তাহার পা কাঁপিতেছিল। ললাটতলে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটিয়া উঠিল। দেহমন এমনি নিস্তেজ হইয়া আসিতেছিল যে, মনে হইল, এখনি বুঝি সে সংজ্ঞা হারাইবে। ঘর ও ঘরের সমস্ত জিনিষপত্র, সমস্তই বোধ হইল যেন ঘুরিতেছে। আর সেই ঘূর্ণ্যমান গৃহের মধ্যে অণিমার হাতের লেখা অক্ষরগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মূর্ত্তি-গ্রহণে অর্থহীন শব্দযোজনা করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার চোখের উপর নর্ত্তন করিতেছিল। সে হাত দিয়া কপাল টিপিয়া নিজেকে স-সংজ্ঞ রাখিবার চেষ্টা করিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যে কখন্ রাত্রি আসিল এবং রাত্রিটাও যে কি-ভাবে কাটিয়া গেল, আদিত্য তাহার খবর দিতে পারে না। দাসী-চাকর আহারের কথা বলিতে গিয়া ধমক খাইয়া চলিয়া আসিয়াছে। শরীর-মনের ক্লান্তিনাশক ঔষধ আসিলে বোতল খালি হইয়া গেল। অসহ্য যন্ত্রণায় মাথা ফাটিয়া যাইতেছিল, নেশা হইল না। রাত্রির মধ্যে একবারও সে বিছানা স্পর্শ করিল নাই। টেবিলে মাথা রাখিয়া চেয়ারে বসিয়াই তাহার প্রায় রাত্রি কাটিয়া গিয়াছে। আদিত্য ভাবিতেছিল,—অণিমা চলিয়া গিয়াছে! সে যাহাকে ভালবাসে, যাহার কাছে ভালবাসা পাইয়াছে,—তাহার সহিতই চলিয়া গিয়াছে! কে সে? কে তাহাকে ভালবাসে? তাহার স্ত্রীকে—তাহার অণিকে, তাহার ঘরের লক্ষ্মীকে শুধু ভালবাসার অধিকারে টানিয়া লইতে পারে—কে সে এমন পুরুষ? অণিমার পিতার টেলিগ্রাম সে পূর্ব্বদিন পাইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন,—"সিমলায় ভয়ানক নিমোনিয়া হইতেছে,—এখন তাহাদের না যাওয়াই ভাল!" তবে? তবে কাহার সহিত সে চলিয়া গেল? সুন্দর হেন যুবা পুরুষ, আদিত্য কাহাকেও মনে করিতে পারিল না। টেবিলের উপর রাশীকৃত হাতে-লেখা পাণ্ডুলিপি, তাহার অধিকাংশ পৃষ্ঠাই ভালবাসার মোহন-সঙ্গীতে পরিপূর্ণ। এগুলি আদিত্যনাথের নিজের রচনা। সেল্‌ফের উপর স্বর্ণাঙ্কিত বাঁধান উপন্যাসগুলিতেও ভালবাসার হা হতোহস্মি ভরা। লেখক আদিত্যনাথ। আর ঐ যে "মৃগতৃষ্ণা" যাহার প্রশংসায় আদিত্যের পথে বাহির হওয়া দায় হইয়া পড়িয়াছে!—ইহাও যে সেই ভালবাসারই গান! কাগজের উপর কালীর আঁচড়, কবির কল্পনা, মোহের বিকার,

সত্যই কি তাই? তবে এত ভালবাসার গান সে গাহিয়াছিল কি করিয়া? আদিত্যের চোখ্ দিয়া জল পড়িতেছিল। তাহার মনে পড়িল, ঐ 'মৃগতৃষ্ণা'র প্রুফ দেখা ও রচনার জন্য প্রায় মাসখানেক হইল অণিমার সহিত একটা ভাল করিয়া কথাও সে করে নাই। কত রাত্রি পর্য্যন্ত ঢাকা-চাপা খাবারের পাশে বসিয়া অথবা কার্পেটের উপর মেঝেয় পড়িয়া ঘুমাইয়াই তাহার রাত কাটিয়াছে! আহারের বা শয়নের জন্য তাগিদ দিলে, অকারণে কত ভৎর্সিত হইয়াছে। মনে পড়িল, কালও যে নিজের রান্না খাওয়াইবার জন্য কত বিনয়ে অনুনয়ে সে সাধ্যসাধনা করিয়াছিল। মনে মনে কখনও সে নিজেকে "পাষণ্ড" বলিতেছিল—কখনও অণিমাকে "পাপিষ্ঠা" বলিয়া গালি দিতেছিল। সে তাহাকে ভুলিতে চায়। জন্মের মত ভুলিতে চায়!—না সে তাহাকে হত্যা করিতে চায়! দুর্ভাগা নারী স্বামীর হৃদয়ভরা প্রেমের এই প্রতিদান দিয়া গেলি? টেবিলের উপর অণিমার হাতের লেখা চিঠিখানি পড়িয়াছিল। আদিত্য তাহা অনেকবার পড়িয়াছে,—চোখের জলে তাহার অনেক জায়গা ভিজিয়া অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে,—তবু সেই বহুবার পঠিত কাগজ-দুইখানি তুলিয়া লইয়া সে আবার পাঠ করিল—"বিশ্বাস ক'রো, আমি তোমায় সমস্ত প্রাণ দিয়েই ভালবাসতুম্। উপন্যাসের নায়িকা বা ঔপন্যাসিকের মত নয়।" হায়! আদিত্য ত কখনও স্ত্রীর ভালবাসায় সন্দিহান হয় নাই। পূর্ণ বিশ্বাসেই যে সে ভালবাসা গ্রহণ করিয়াছে;—সেই ভালবাসারই বলেই বলীয়ান্ হইয়া সে যে জগৎকে ভালবাসার রাগিণী শুনাইতেছিল। অণিমা আজ দুই পা দিয়া তাহার সুরবাঁধা বেহালার তার মাড়াইয়া ভাঙ্গিয়া দিয়া গিয়াছে! আদিত্যের মনে হইল, এতদিন সে বৃথাই ভালবাসার গান গাহিয়া আসিয়াছে। ক্ষণে ক্ষণে সন্দেহ, ক্রোধ ও ঈর্ষায় সে যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিতেছিল। ঘরের মেঝেয় রাশীকৃত কাগজপত্র ছড়াইয়া, সমস্ত জিনিসপত্র ওলোট-পালট করিয়া সমস্ত দিন সে ঘরের ভিতর পাগলের মত ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইল। (ক্রমশঃ)

শ্রীইন্দিরা দেবী।

হিন্দুর তীর্থনিচয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বাবর ও ঔরঙ্গজেব অযোধ্যা-ধ্বংস করেন্। মুসলমানগণ এখানে তাহাদিগের রাজধানী করিলে হিন্দুদিগের তীর্থ-মাহাত্ম্য অত্যন্ত ক্ষুণ্ণতা প্রাপ্ত হয়। আক্‌বর ও মহম্মদ সা অযোধ্যায় টাকশাল তৈয়ার করেন্।

অযোধ্যা মন্দিরে পরিপূর্ণ। ইহা যে কেবলমাত্র হিন্দুদিগের তীর্থস্থান, তাহা নহে। জৈনদিগেরও ইহা একটী তীর্থ। মুসলমানদিগের অনেকগুলি মসজিদ ও সমাধি-স্থান এস্থানে দৃষ্ট হয়। মুসলমান-রাজত্বের সময় অযোধ্যার হিন্দুদিগের কেবলমাত্র তিনটী তীর্থস্থান ছিল। সেগুলির নাম—জন্মস্থান,

স্বর্গদ্বার এবং ত্রেতাকা-ঠাকুর। জন্মস্থানটী রামকোটে অবস্থিত। এখানে রামচন্দ্র জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৫২৮ খৃঃ বাবর অযোধ্যায় সমাগত হইয়া উক্ত স্থানটী ভাঙ্গিয়া তদুপরি একটি মসজিদ তৈয়ার করেন্। তদবধি তাহা বাবরের মসজিদ নামে খ্যাত। মসজিদ-নির্ম্মাণ করিতে অবশ্য চূর্ণীকৃত পুরাতন হিন্দুমন্দিরের চূণ সুরকী ব্যবহৃত হইয়াছে।

মুসলমানেরা হিন্দুর তীর্থ কলঙ্কিত করিলে মুসলমানদিগের সহিত হিন্দুদিগের ঘোরতর বিবাদ হয়, এমন কি রক্তপাতও হইয়া গিয়াছে।

১৮৫৫ খৃঃ মুসলমানগণ "জন্মস্থান" বল-পূর্ব্বক দখল করিয়া "হনুমান্‌গাড়ীর" উপর আক্রমণ করে। তাহারা হিন্দুদিগকে মন্দিরের সিঁড়ি পর্য্যন্ত খেদাইয়া লইয়া যায় কিন্তু মুসলমান-পক্ষের অনেক লোক হত হওয়াতে হটিয়া আইসে। তখন হিন্দুরা তাহাদিগকে আক্রমণপূর্ব্বক "জন্মস্থান" হস্তগত করে। জন্মস্থানের সন্নিকটে হিন্দু-মুসলমানে যে সংঘর্ষ হয়, তাহাতে ৭৫ জন মুসলমান হত হয়। এইজন্য মুসলমানেরা স্থানটীকে "গঞ্জ-সাহিদান"-নামে অভিহিত করে। গঞ্জ-সাহিদানের অর্থ—ধর্ম্মরক্ষার্থ আত্মত্যাগ। নবাবের সৈন্য সংঘর্ষকালে উপস্থিত ছিল বটে, কিন্তু তাহাদিগের উপর এমন কোন হুকুম ছিল না যে, তাহারা এ-বিষয়ে বাধা দেয়। ইহার অব্যবহিত কাল পরে লক্ষ্ণৌ-জেলার অন্তঃপাতী আমেঠী-নামক স্থানের আমীর আলি-নামক জনৈক মৌলভী সৈন্য-সংগ্রহ করিয়া হনুমান্‌গাড়ী দখল করিবার প্রয়াসে অগ্রসর হয়; কিন্তু তাহার গতি বারাবান্‌কি-জেলাতেই রুদ্ধ করা হয়। তদবধি হিন্দু-মুসলমান একই ইমারতে স্ব স্ব পূজাদি করিত, কিন্তু সিপাহী-বিদ্রোহের পর হইতে মুসলমানগণ স্থানটীকে ঘিরিয়া লইয়াছে। তদবধি হিন্দুগণ বাহিরে একটী মঞ্চ গঠিত করিয়া পূজাদি করিয়া থাকে। এই মঞ্চে এক পর্ণকুটীর আছে; তাহাতে ভগবান্ দাশরথির মূর্ত্তি বিরাজিত। "স্বর্গদ্বারে" যে মন্দির ছিল, তাহাও মুসলমানগণ চূর্ণ করিয়াছেন্।

স্বর্গদ্বার-ঘাটে লোকে স্নান করে। ইহার সিঁড়িগুলি প্রস্তর-নির্ম্মিত। এই ঘাটটীকে রাজা দর্শন সিংহ নির্ম্মাণ করেন্। "ত্রেতাকা-ঠাকুর"-নামক স্থানে রামচন্দ্র যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই স্থানে তিনি তাঁহার নিজের ও সীতাদেবীর মূর্ত্তি স্থাপিত করেন্। পঞ্জাবের কুলু-নামক স্থানের জনৈক রাজা দুইশত বর্ষ পূর্ব্বে এই স্থানটী নির্ম্মিত করিয়া দেন এবং ইন্দোরের যশোবন্ত রায় হোলকারের স্ত্রী অহল্যাবাই ১৮৮৪ খৃঃ স্থানটীর উন্নতি সাধন করেন্। তিনি স্বীয় নামে আর একটী মন্দিরও নির্ম্মিত করিয়াছিলেন। ঔরঙ্গজেব পূর্ব্বকথিত যে পুরাতন মূর্ত্তি নদীজলে নিঃক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধার করিয়া নূতন ত্রেতাকা মন্দিরে রক্ষিত হইয়াছে। দিবাভাগে মন্দিরটী রুদ্ধ থাকে। কেবল কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশী, শুক্লপক্ষীয় সপ্তমী, রাম-নবমীর তিন চারি দিন রাত্রিতে এবং কার্ত্তিকী মেলায় মন্দিরটী উদ্ঘাটিত রাখা হয়। মন্দিরের পরিচালনার জন্য ৩টী গ্রাম আছে। তাহাদের আয় হইতে মন্দিরের খরচ চলিয়া থাকে।

অযোধ্যা বৈষ্ণবদিগের প্রধান স্থান।

মাহাত্ম্যে ইহা মথুরা ও হরিদ্বার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

অযোধ্যার মুখ্য তীর্থস্থানটী রামকোটে অবস্থিত। পুরাতন মন্দিরটী যদিও নাই, তথাপি এখানে অনেকগুলি সুবৃহৎ মন্দির আছে। ইহাদিগের মধ্যে যেটী বৃহৎ, তাহা হনুমান্-গাড়ী-নামে খ্যাত। এখানে বানরের সংখ্যা এত অধিক যে, তাহা হনুমান্‌দিগের গড় বলিয়াই মনে হয়। একটী উচ্চ স্থানের উপর হনুমান্-গড় অবস্থিত। পঞ্চাশ বা ষাট্ সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া হনুমানজীর দর্শন পাওয়া যায়। গাড়ীর মধ্যে প্রস্তর-নির্ম্মিত একটী ক্ষুদ্র মন্দির আছে। তাহাতেই হনুমান্‌জী থাকেন্। এই মূর্ত্তি বীরাসনে উপবিষ্ট আছেন্। এখানে সন্ধ্যাকালে কথক-ঠাকুর রামকথা (রামায়ণ) শুনান্। শুনা যায় যে, প্রথমে এই "গাড়ী" গোঁসাইদিগের ছিল, পরে তাহা বৈরাগীদিগের হস্তগত হয়। অযোধ্যার সুবেদার সাদত আলি খাঁর আমল-দারীতে এই গাড়ীর সূত্রপাত হয় এবং ওয়াজিদ আলির সময়ে ইহা সুদৃঢ় হইয়াছিল। গাড়ীতে সহস্রাধিক বৈরাগীর বাস। ইহার নীচে গুহার ন্যায় অনেকগুলি ঘর আছে। উক্ত ঘরের ভেদ প্রধান-বৈরাগী ভিন্ন অন্য কেহ জানে না। এই গাড়ীর ঠিক্ সম্মুখে স্বর্গীয় মহারাজ মানসিংহের ধর্ম্মপত্নী-দ্বারা নির্ম্মিত এক মন্দির আছে। মন্দিরটী রাজদ্বার-নামে খ্যাত। সৌন্দর্য্যে ইহা গাড়ীর তুল্য না হইলেও উচ্চতায় এবং চাকচিক্যে উহার কম নহে। ঢিবির উপর জন্মস্থান অবস্থিত। এইস্থানে রামচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হন্। ইহার সন্নিকটে "কনক-ভবন"। উক্ত বাটীটী টিকমগড়ের রাণী-দ্বারা নির্ম্মিত। এতদ্ব্যতীত সীতাকা রসোই (সীতার রান্নাঘর), বড়া স্থান, রতন সিংহাসন, রঙ্গমহল, আনন্দ-ভবন, কৌশল্যা-ভবন বা জন্মভূমি, অমর দাস এবং অন্যান্য মন্দির ও তীর্থ অবস্থিত। রতন সিংহাসনটী রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের স্থান। আনন্দভবনে কৌশল্যার ক্রোড়ে রাম, কৈকয়ীর ক্রোড়ে ভরত, সুমিত্রার ক্রোড়ে শত্রুঘ্ন এবং দশরথের সমক্ষে লক্ষ্মণ দৃষ্ট হইয়া থাকেন্। এখানে বশিষ্ঠ ও কাক-ভুশণ্ডিরও মূর্ত্তি আছে।

হনুমান্-গড়ী হইতে মূল রাস্তাটী নদীর দিকে বামভাগে ভুর ও শিশমহল মন্দির এবং দক্ষিণ ভাগে কৃষ্ণ, উমাদত্ত এবং তুলসীদাসের মন্দির পার হইয়া চলিয়া গিয়াছে। রাস্তার পশ্চিম ধারে নদীতটে স্নানের জন্য ঘাটিয়াজি ও তদুপরি মন্দির আছে। তন্মধ্যে মুখ্যগুলির নাম "স্বর্গদ্বার," 'জানকীতীর্থ," "নাগেশ্বর মহাদেব," "চন্দ্রহরি," "লক্ষ্মণঘাট" (সহস্র ধারা) ও "লছমন কিলা"। রাস্তার পশ্চিম দিকে অনেকগুলি মন্দির আছে। এতদ্ব্যতীত সুগ্রীবকুণ্ড, ধর্ম্মহরি, মুজফরপুরের সুরসুর-নায়ক স্থানের রাণীর দ্বারা নির্ম্মিত মন্দির, মণিরাম ছাউনি ও অযোধ্যামহারাজের শ্বেত-প্রস্তর-নির্ম্মিত মন্দির উল্লেখযোগ্য।

মহারাজের রাজধানী এবং রাণীবাজার অতিক্রম করিয়া দক্ষিণে দর্শন-নগরের দিকে যাইলে একটি উচ্চ ঢিবি আমাদিগের দৃষ্টি পথের পথিক হয়। ইহা মণিপর্ব্বত নামে খ্যাত। প্রবাদ এইরূপ যে, লক্ষ্মণ যখন শক্তিশেলে পতিত হন্, তখন হনুমান্ লঙ্কা হইতে হিমালয়ে ঔষধ আনিবার জন্য প্রেরিত

হ'ন্। হনুমান্ ঔষধ চিনিতে না পারিয়া সমগ্র পর্ব্বতটাই মস্তকে লইয়া প্রস্থান করেন্। শূন্যে গমন কালে পর্ব্বতটার কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া অযোধ্যায় পতিত হয়। মণিপর্ব্বত তাহারই নিদর্শনমাত্র। রামকোটের দক্ষিণ পশ্চিমদিকে দুইটী যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টিবি দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে একটি সুগ্রীবপর্ব্বত নামে খ্যাত।

অযোধ্যায় সর্ব্বশুদ্ধ ১৪৫টী তীর্থস্থান আছে। তন্মধ্যে ৮৩টী অযোধ্যা সহরের ভিতর ও বাকীগুলি দক্ষিণদিকের সন্নিকটে অবস্থিত। পশ্চিমপ্রান্তে গুপ্তহরির মন্দির। ফয়জাবাদের ক্যান্টনমেণ্টে গুপ্তার পার্ক নামে একটী উদ্যান আছে। গুপ্তহরির মন্দির তাহারই মধ্যে অবস্থিত। ভাদারসার নিকট ভরতকুণ্ড, জলালুদ্দিন নগরে বিষ্ণহরি এবং অন্যান্য কুণ্ড; যথা সূর্য্যকুণ্ড, রামকুণ্ড, বিভীষণকুণ্ড এবং নির্ম্মলিকুণ্ড দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই তীর্থগুলিও অযোধ্যার পরিক্রমার সীমানার অন্তর্গত।

অযোধ্যার অনেক মন্দিরের বৃত্তি আছে। সহরটীতে যে-সকল মেলা হয়, তন্মধ্যে চৈত্রমাসে রামনবমীই সর্ব্বপ্রধান। এই মেলাতে প্রায় চারিলক্ষ লোক সমবেত হয়। ইহার পরই শ্রাবণমাসের ঝুলা। ইহাতেও প্রায় তিনলক্ষ লোক একত্র হইয়া থাকে। কার্ত্তিক-মাসেও দুইটী মেলা হয়। তন্মধ্যে একটি পরিক্রমার মেলা ৯ই কার্ত্তিক ও অন্যটী কার্ত্তিকী পূর্ণিমার মেলা। এই সময়ে প্রায় দুই লক্ষ লোক সর্যূনদীতে স্নান করিবার জন্য আগমন করে। এতদ্ব্যতীত শ্রাবণ-মাসে লক্ষ্মণঘাটে ও ভাদ্রমাসে বশিষ্ঠকুণ্ডে মেলা হয়। অবশ্য এ দুইটী ক্ষুদ্র মেলা। গোবিন্দ দ্বাদশীর মেলাটীও বৃহৎ নহে। এতদ্ব্যতীত প্রতিমঙ্গলবারে লোকেরা হনুমান্-গাড়ীতে পূজা দিতে গমন করে।

অযোধ্যায় রাজরাজেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতিমূর্ত্তি আছে। ইহা সহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত।

অযোধ্যা হিন্দুর স্থান। সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষ্ণবগণের সংখ্যাই এখানে অধিক। ইহাদিগের মধ্যে বৈরাগীই বহুল সংখ্যায় দৃষ্ট হয়। বৈরাগিগণ ৭টী আখাড়ায় বিভক্ত। ষোড়শবর্ষ বয়স না হইলে লোকে বৈরাগিদলভুক্ত হইতে পারে না। চেলাদিগের মধ্যেও পার্থক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহারাও অবস্থানানুসারে ঊর্দ্ধে উন্নীত হয়। প্রথম অবস্থার নাম "ছোরা"। এই অবস্থা তিন বৎসর পর্য্যন্ত থাকে। এই সময়ে তাহাদিগকে নীচকার্য্যাদি, যথা বাসন-মাজা, কাষ্ঠবহন ইত্যাদি করিতে হয়। দ্বিতীয়াবস্থাও তিন বৎসর থাকে। এই সময়ে চেলারা "বান্দাগিদড়"-নামে খ্যাত হয়। বিশেষ বিশেষ বাসন-পরিষ্কার, রন্ধন ও পূজা তাহাদিগের নিত্য কর্ম্ম। ইহার পরেই তৃতীয়াবস্থা। ইহাও তিন বৎসর থাকে। এই সময়ে চেলারা "হরদাঙ্গা"-নামে খ্যাত। দেবতার ভোগ দেওয়া, অন্যান্য চেলাগণকে আহার-বণ্টন করা, পূজাদি-নির্ব্বাহ করা ও মন্দিরের ধ্বজাদি-বহন করা তাহাদিগের কর্ম্ম। দশম বৎসরে চেলারা চতুর্থ অবস্থায় প্রবেশ করে। এই সময়ে তাহারা "নাগা"-নামে খ্যাত হয়। এই কালে তাহারা অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া ভারতের সকল তীর্থ পর্য্যটন করে এবং ভিক্ষান্ন-দ্বারা স্বীয় উদরপূর্ত্তি করিয়া থাকে। তীর্থভ্রমণ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাহারা পঞ্চম অবস্থায়

উন্নীত হয়। এই সময়ে তাহারা "অতীত" আখ্যা পাইয়া থাকে। এই অবস্থাটি তাহাদিগের জীবনের শেষ পর্য্যন্ত থাকে। এই পূজাদি ব্যতীত তাহারা অন্য কর্ম্ম করে না এবং আহারাদি পাইয়া থাকে।

কোন উৎসবে সন্ন্যাসিদল বহির্গত হইলে তাহারা ক্রমানুসারে সাতটী শ্রেণীতে গমন করে। সর্ব্বপ্রথমে দিগম্বরী, পরে দক্ষিণে নির্ব্বাণী ও বামে নির্ম্মোহী থাকে। নির্ব্বাণীর পশ্চাৎ তৃতীয় শ্রেণীতে দক্ষিণদিকে খাকী ও বাম দিকে নিরালম্বী অবস্থান করে। নির্ম্মোহীর পর সন্তোষী ও মহানির্ব্বাণিগণ উক্ত নিয়মে শ্রেণীবদ্ধ হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে, সমক্ষে ও পক্ষে একটু করিয়া স্থান খালি থাকে। দিগম্বরিগণ নগ্ন। ইহাদিগের প্রতিষ্ঠাতার নাম বলরাম দাস। ইনি দুইশত বৎসর পূর্ব্বে অযোধ্যায় সমাগত হইয়া একটী মন্দির-নির্ম্মাণ করেন। দিগম্বরীদিগের সংখ্যা অত্যন্ত কম কিন্তু তথাপি তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ। গোরখপুর, পুরাইনা, কালুপুর ও তাণ্ডায় ইহাদিগের ব্রহ্মোত্তর জমি আছে। নির্ব্বাণীদিগের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইহারা হনুমানগড়ীতে বাস করে। ইহাদিগের মধ্যে যাহারা অযোধ্যায় বাস করে, তাহাদিগের সংখ্যা ২৫০ জন। ইহারা আহার পাইয়া থাকে। নির্ব্বাণিগণ চারিভাগে বিভক্ত; যথা—হরিদ্বারী, বসন্তীয়া, উজ্জৈনীয়া এবং সাগরীয়া। ইহাদিগের প্রত্যেক শ্রেণীর এক একটী মোহান্ত আছে; কিন্তু উক্ত চারি বিভাগের উপরও একজন প্রধান মোহান্ত দৃষ্ট হয়। ইনিই গদির মালিক। নির্ব্বাণিগণ খুবই সমৃদ্ধ। কয়জাবাজ, গোণ্ডা, বস্তি, প্রতাপগড় ও সজ্জানপুরে ইহাদিগের ব্রহ্মোত্তর জমি আছে। এতদ্ব্যতীত তাহাদিগের সুদী-কারবার আছে। সুতরাং আয়ও বিলক্ষণ হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত তীর্থকামী ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে পূজা-স্বরূপ ইহারা যাহা প্রাপ্ত হয়, তাহাও কোন অংশে কম নহে।

নির্ম্মোহীদিগের প্রতিষ্ঠাতার নাম গোবিন্দ দাস। ইঁহার নিবাস জয়পুরে। পূর্ব্বে নির্ম্মোহিগণ রামকোটের "জন্মস্থানে" বাস করিত, কিন্তু মুসলমানগণ রামকোট ধ্বংস করা অবধি তাহারা রামঘাটে আসিয়া আছে। এখানে আসার পর গদি লইয়া তাহাদিগের দলে একটা বিরোধ হয়। সুতরাং, তাহাদিগের একদল রামঘাট পরিত্যাগ করিয়া গুপ্তার ঘাটে আসিয়া বাস করে। বস্তি, মনকাপুর এবং খুর্দাবাদে গুপ্তার ঘাটের নির্ম্মোহীদিগের ব্রহ্মোত্তর জমি আছে, কিন্তু তাহা যাত্রীদিগের পূজার উপর নির্ভর করে। নবাব সুজাউদ্দৌলার সময় খাকীর দল অযোধ্যায় সমাগত হয়। এই দলের স্থাপয়িতার নাম দয়ারাম। ইহার নিবাস চিত্রকূট। ইনি চারি বিঘা জমি প্রাপ্ত হন এবং তদুপরি মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ইঁহাদিগের সংখ্যা ১৮০ জন, তন্মধ্যে ৫০ জন অযোধ্যায় বাস করে বাকী ঘুরিয়া বেড়ায়। বস্তি ও গোণ্ডায় খাকীদিগের জমিদারী আছে। নিরালম্বিদলের প্রতিষ্ঠাতার নাম বীরমল দাস। ইহার নিবাস কোটা। অযোধ্যায় আসিয়া ইনি মন্দির নির্ম্মাণ করেন, কিন্তু কোন কারণবশতঃ অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। নরসিং-দাস নামক তাঁহার একজন উত্তরাধিকারী

দর্শনসিংহের মন্দিরের সন্নিকটে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সন্তোষীর দল অতিক্ষুদ্র এবং তাহাদিগের কোনও বৃত্তি নাই; সুতরাং তাহারা অত্যন্ত গরীব। (ক্রমশঃ)

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী।

৺কৃষ্ণভাবিনী দাস।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কৃষ্ণভাবিনীর পতির স্বদেশাগমন।

পতি-বিরহিণী কৃষ্ণভাবিনী শাশুড়ীর মৃত্যুতে সংসার আরও শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন। এমন বৃহৎ পরিবারের, এমন ধনীর সংসারের বধূ হইয়াও ভাবিনী নিরালস্য-ভাবে সমস্ত দিনই গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া অধিক রাত্রিতে যখন শয়নগৃহে আসিতেন, তখনই পত্রাদি-লেখার অবসর পাইতেন। আমি ভাবিনীর পত্রে তারিখ ও সময় যাহা লেখা থাকিত, সে সময় জানিয়া অবাক্ হইতাম। তত রাত্রিতে কস্মিন্‌কালে আমার লেখাপড়ার প্রবৃত্তি হয় না। কোনও পত্রে লেখা—"রাত্রি ১১টা" কোনওটীতে ১২টা বা ১টা। মনে মনে ভাবিতাম, আহা বেচারা স্বামীকে যে-দিন পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হয়, সেদিন রাত্রি প্রভাত হইয়া যায় বুঝি! এইরূপে কিছুদিন গত হইলে, যখন শুনিলাম কৃষ্ণভাবিনীর স্বামী দেবেন্দ্রনাথ এইবার পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া দেশে ফিরিবেন, তখন আমার আনন্দের সীমা রহিল না। একদিন বসন্তকুমারীর পত্রে দেবেন্দ্রনাথের স্বদেশাগমন, তাহাদের আনন্দ-মিলন, পরিবারস্থ সকল ভ্রাতা, ভগ্নী ও বধূগণের আনন্দোৎসব-বিবরণ তিন চারি পৃষ্ঠা আনন্দোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ সংবাদ পাইয়া প্রাণ উল্লসিত হইল। তাহার পর যখন কৃষ্ণভাবিনীর সলজ্জ ধীরহস্তের একখানি পত্র পাইলাম, তখন অন্তরে কিরূপ আনন্দ-তরঙ্গ উঠিল বলিতে পারি না। কিন্তু হায়! কোনদিনই সংসার কৃষ্ণভাবিনীর অনুকূল নয়! এ সুখের দিনেও তাঁহার প্রাণে সম্পূর্ণ সুখ-শান্তি আসিল না। কারণ, গৃহে আসিয়াও দেবেন্দ্রনাথ গৃহ পাইলেন না। তখন দেবেন্দ্রের স্নেহময়ী জননীর কাল হওয়ায় মাতৃকক্ষ শূন্য দেখিয়া তাঁহার প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। বিলাত-প্রত্যাগত পুত্রকে পিতা নিজগৃহে স্থান দিতে অসম্মত হওয়ায় সেই মাতৃশোক দেবেন্দ্রনাথের শত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল। দেবেন্দ্রনাথ সরকারী চাকরীর কখনই পক্ষপাতী ছিলেন্ না। দেশের লোকও এমন কৃতবিদ্য মনীষি-ব্যক্তির সম্মান আদর জানিল না। মনোভঙ্গ হইয়া দেবেন্দ্রনাথ যখন পত্নীসহ স্বতন্ত্র বাসায় আসিলেন, শ্রীনাথ দাস আদরিণী পৌত্রীকে তাহার মাতা পিতার নিকট দিলেন না। ইহাতে দেবেন্দ্রনাথ অপেক্ষা কৃষ্ণভাবিনী যে কিরূপ অধিকতর ব্যথিত হইলেন, তাহা সন্তানবতী রমণীমাত্রই বুঝিবেন। অভিমানী দেবেন্দ্রনাথ অভিমান-ভরে পিতার আর এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করিলেন না। দূরে থাকিয়া ছোটদিদির মুখে ও বসন্তকুমারী ও সেজবধূর পত্রে সকল সংবাদ জানিয়া মনে ক্লেশ

পাইলাম। ছোটদিদির সঙ্গে দেখা হইলে, দুইজনে ঐকথা কহিয়াই কেবল মনের ক্ষোভ-নিবৃত্তি করিতাম। তিনি আমার কাছে এ-দুঃখের কথা কহিয়াও স্বস্তি বোধ করিতেন ও তাঁহার ননন্দার জন্য দুঃখ-প্রকাশ করিতেন। ছোটদিদি ও তাঁহার স্বামী চিরদিন দেবেন্দ্রনাথ ও মধ্যম জ্ঞানেন্দ্রনাথকে ও ভাগনেয়ী স্বর্ণলতাকে অত্যধিক স্নেহ করিতেন্। ইহারাও মাতুলানী মাতুলকে ততোধিক ভক্তি করিতেন। দেবেন্দ্রনাথের সবিশেষ পক্ষপাতী ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ দেবেন্দ্রের অবস্থা-দর্শনে অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন, কিন্তু পিতার উপর কথা কহিবার ত কাহারও সাহস নাই। এইরূপে দুই চারি মাস গত হইলে, কলিকাতা-নগরীর মধ্যে বাস করিয়া স্বগৃহ ও পিতৃ-সন্নিকটে এত পর হইয়া থাকা এবং এরূপ অত্যন্ত ধনীর পুত্রের এইরূপে সামান্যভাবে বাস তাঁহাকে পুনঃপুনঃ দূরান্তরে যাইবার সংকল্পেই বাধ্য করাইল। সাধ্বী কৃষ্ণভাবিনী ছায়ার ন্যায় স্বামীর পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহার মতেই মত দিয়া আসিতেছিলেন। যখন তিনি বুঝিলেন, স্বামী পুনরায় বিলাত যাইতে ইচ্ছুক, তখন বিষম সমস্যার মধ্যে পড়িয়া চিন্তাকুল হইলেন। দীর্ঘ ছয় বৎসর যে প্রিয়তম পতি হইতে বঞ্চিত থাকিয়া জীবন দুর্ব্বহ হইয়াছিল, তাঁহাকে আবার দূরেই বা প্রাণ ধরিয়া ছাড়িতে পারেন কিরূপে! আবার একমাত্র কন্যাকে পরিত্যাগ করিয়া বিধবা জননীর কাতরোক্তিতে কর্ণপাত না করিয়া এত আত্মীয়স্বজনের প্রাণের মমতায় বিসর্জ্জন দিয়া পতি-সমভিব্যাহারিণী হইয়া অপরিচিত দেশে অজ্ঞাত-জনমণ্ডলীর বিজাতীয় আচরণের মধ্যে প্রবেশ করা কি দুরূহ ব্যাপার! অনেক চিন্তার পর পতি-প্রাণা কৃষ্ণভাবিনীর স্বামীর মূল্যই সকলের অপেক্ষা অধিক ও স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্য-পালনই স্ত্রীর সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য, ইহা স্থির হওয়ায় তিনি অপত্য-স্নেহ মাতৃঅনুরোধ,—সকল দূরে রাখিয়া, নিজের বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতি যাবতীয় দ্রব্যের বিনিময়ে অর্থ-সংগ্রহান্তর পতিব্রতের অনুসারিণী হইয়া বিলাতে চলিয়া গেলেন।

যে-দিন এই সংবাদ ছোটদিদির মুখে পাইলাম, কত যে ক্লেশ পাইলাম মনে, তাহা বলিতে পারি না। প্রিয়বন্ধু কৃষ্ণভাবিনী দেশ ছাড়িয়া গেলেন, আমায় একবার জানাইলেন না, এই প্রথম দুঃখ। তার পরে মনে হইল, তিনি আর বুঝি দেশে ফিরিয়া আসিবেন্ না, আর কখন তাঁহাকে দেখিতে পাইব না। এই ভাবিয়া চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে এতাবৎকাল কৃষ্ণভাবিনী যত পত্র লিখিয়াছিলেন, তৎসমুদয় বাহির করিয়া পড়িতে বসিলাম; মনোযোগ দিয়া দেখিয়াও কোথাও তাঁহার যাইবার অভিপ্রায় খুঁজিয়া পাইলাম না। কিছুদিন পরে যখন শুনিলাম, আমার ভাগিনেয়দ্বয় শিক্ষার্থ বিলাত-যাত্রা করিতেছে, তখন সেই সুযোগে তাহাদের নিকট কৃষ্ণভাবিনীর জন্য আমার মর্ম্মব্যথাপূর্ণ একটী কবিতা দিয়া কৃষ্ণভাবিনীর সহিত দেখা করিতে বলিয়া যেন আমার প্রাণে অনেক আরাম বোধ হইল। ইহার পর আমার যে কোন আত্মীয় বিলাত হইতে ফিরিয়া আসে, তাহাকেই কৃষ্ণভাবিনীর ও তাঁহার স্বামীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু সবিশেষ সংবাদ কিছুই না পাইয়া হতাশ হই। একবার

বিলাত-প্রত্যাগত কোনও আত্মীয়ের মুখে শুনিলাম, "দেবেন্দ্রনাথ বড়ই স্বাধীনচেতা; সেখানেও সামান্য চাকরী লইতে ইচ্ছুক নয়। এজন্য সেই শীতের দেশে দুইজনকে অতি-ক্লেশেই দিনপাত করিতে হয়। তাঁহারা এখন অতিগুপ্তভাবে অবস্থিতি করেন বলিয়া আমি সাক্ষাতের সুবিধা পাই নাই।" এই সকল শুনিয়া বড়ই দুঃখ হইল; কৃষ্ণভাবিনীর উপর কিছু রাগও হইল। কেন সে এত অতুল ঐশ্বর্য্য ফেলিয়া কষ্ট করিতে চলিয়া গেল! আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী কহিলেন, মা, সে সতী লক্ষ্মী, স্বামীর কাছে আছে, তাতে আর দুঃখ কি! এতো ভাগ্যির কথা।" এই কথায় মনে হইল, সত্যিই ত এও তাঁর সৌভাগ্য বৈ কি! এতদিন ত এই রত্ন ছাড়া হইয়া কৃষ্ণভাবিনী অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যেও প্রাণে কোনও সুখ উপলব্ধি করেন নাই। কত দুঃখময় কবিতা, কত মর্ম্মোক্তিপূর্ণ তাহার পত্র-সকল আমার কাছে ইহার উজ্জ্বল প্রমাণ দিতেছে! ভাবিলাম, সাধ্বী কৃষ্ণভাবিনী পতিরত্নের যথার্থ মূল্যই বুঝিয়াছেন! যিনি স্বামীকে দেখিয়া, স্বামীর সেবা করিয়া অন্য সকল সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া সহস্র অসুবিধা ও ক্লেশকে আনন্দে বরণ করিয়া লইতে পারিয়াছেন, তাঁহার মত নারী-রত্ন দুর্লভ। তখন কৃষ্ণভাবিনীর প্রকৃত মূল্য আমার নিকট বোধগম্য হওয়ায়, শ্রদ্ধাভরে সেই বয়ঃকনিষ্ঠাকেও আমার প্রণাম করিতে ইচ্ছা হইল। মনে মনে মঙ্গলময়কে স্মরণ করিয়া ও তাঁহার কল্যাণ-কামনা করিয়া প্রাণে শান্তি পাইলাম।

ভারতে পুনরাগমন।

কৃষ্ণভাবিনীর সহোদরাসম ভ্রাতৃগণও আমাকে পত্রাদি লিখিতেন। তাঁহার তৃতীয় ভ্রাতা জ্ঞানদা, মার্জ্জিতবুদ্ধি ও সুশিক্ষিতা ছিলেন। তাঁহার পত্রে কখন কখন কৃষ্ণভাবিনীর কিছু কিছু সংবাদ পাইব, আশা করিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি লিখিলেন, "তাঁহারা এখানে আর কোন সংবাদই দেন্ না। ঠাকুরপো দেশের মায়া কাটাইয়াই ইংলণ্ডে এবার গিয়াছেন।" তখন কৃষ্ণভাবিনীর সংবাদের আশায় একে-বারেই হতাশ হইলাম। কিন্তু ছোটদিদি যেন কোন দিন বলিয়া থাকিবেন যে, "মেজ ভাইকে কখন কখন পত্রাদি লেখে দেবেন।" ইহার ৪৫ বৎসর পরে একদিন জ্ঞানদা একখানি পত্রে আমাকে লিখিলেন, "এতদিন পরে ঠাকুর-পো তোমার ভাবিনীকে পাকা মেমসাহেব সাজাইয়া দেশে লইয়া আসিয়া-ছেন।" যে-সময় পত্র পাইলাম সে বড় দুঃসময় আমার। মনের উচ্ছ্বাস-ভরে আমার এই অল্প বিদ্যায় কবিতা লিখিয়া জ্ঞানদাকে জানাইলাম, ভাবিনীর স্বদেশাগমে কত আনন্দলাভ করিয়াছি! সে-কবিতা দেখিলে আধুনিক কবি রমণীগণ হাসিবেন। কোন কবি বাঙ্গালীর মেয়ের অল্প বিদ্যায় লেখার ধুম দেখিয়া লিখিয়াছেন, "পাতভেড়ে পড়োর মত অক্ষরের ছাঁদ, কলাপাতে না এগোতে গ্রন্থ লেখা সাধ!" যা হোক্, বন্ধু জ্ঞানদা তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে ৪ পৃষ্ঠা পূরিয়া পত্রোত্তর দিলেন। অল্প বয়সে সে একদিন গিয়াছে, মনে হইলে, এই অবসাদগ্রস্ত জীবনের সন্ধ্যাকালও আনন্দা-লোকে উজ্জ্বল হয়।

তাহার পর যখন ভাবিনীর বাসস্থানের ঠিকানা পাইলাম, তখন একবার তাহাকে স্বচক্ষে দেখিবার জন্য বড়ই ব্যগ্র হওয়াতে আমার বাল্য-সমপাঠী দেবেন্দ্রনাথ-সন্নিধানে গমন করিয়া দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া আসিলেন। তখন দেবেন্দ্রনাথের সুদিন দেখা দিয়াছে। তিনি কলিকাতা-মহানগরীতে স্বয়ং বিদ্যালয়-স্থাপন-পূর্ব্বক স্বকৃত নব নিয়মানুসারে, সুশৃঙ্খলায় সস্ত্রীক অহর্নিশ পরিশ্রমে মহাপ্রশংসার সহিত ফল লাভ করিয়া, ছাত্রবৃন্দকে উচ্চশিক্ষা দান করিতেছেন ও নগরীস্থ জনগণের অশেষ শ্রদ্ধা-ভাজন হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে দিন-যাপন করিতেছেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে আমি পুত্র-কন্যা লইয়া গমন করিলে ভাবিনী অতিশয় আদরের সহিত আমাদিগকে আহ্বান করিয়া লইলেন। বহুদিনের পর মিলনের যে সুখ, তাহা যথার্থই অনুভব করিলাম। ভাবিনী আমাকে তাঁহার স্বামীর সহিত পরিচিত করিয়া দিতে চাহিলেন, কিন্তু আমাদের মত অবরুদ্ধা অশিক্ষিতা বঙ্গ-রমণীর পক্ষে তাহা অতিশয় অশোভন মনে করিয়া তাহাতে অসম্মত হইলাম। সেই কারণে দুইটী রত্ন একত্রে দেখা আর ভাগ্যে ঘটিল না।

যে সময়টুকু আমি কৃষ্ণভাবিনী-দর্শন-সুখে অতিবাহিত করিলাম, সেই সময়ের মধ্যেই ভাবিনী কথা কহিতে কহিতে যে সময়ের যে কাজ, সকলই ত্বরিত হস্তে মনো-যোগের সহিত নিষ্পন্ন করিলেন ও তাহারই মধ্যে দুইবার স্বামীর কি প্রয়োজন জানিয়া আসিলেন। এই সময় তাঁহাদের আর্থিক ক্লেশ ছিল না এবং ভৃত্যবর্গের অবস্থিতি সত্ত্বেও তাঁহাকে স্বামীর কার্য্যগুলি সমস্তই নিজহস্তে করিতে ইচ্ছুক, দেখিলাম। সময়ের সদ্ব্যবহারে ভাবিনীকে কত তৎপর দেখিলাম। যেন কলের পুতুলের মত দ্রুতপদে ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতেছেন। দেখিলাম, শিক্ষিত সভ্যদেশে গমন করিয়া ও সেস্থানের সুনিয়ম-প্রণালীদর্শনে জ্ঞান-শিক্ষায় কৃষ্ণভাবিনী ইওরোপের লোকদের গুণগুলিই গ্রহণ করিয়া দোষগুলি সম্পূর্ণ পরিহার করিয়াছেন। এমন আমি কখনও কাহাতে কোনও দিন দেখি নাই। আমার পরিচিত আত্মীয় এ পর্য্যন্ত অনেক রমণীকে বিলাত-প্রত্যাগতা দেখিলাম, কিন্তু এরূপ আড়ম্বরপরিশূন্য আর কাহাকেও দেখি নাই। ইহাতে সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট ও আনন্দিত হইলাম। সুদীর্ঘকাল বিলাতে থাকিয়াও যে ভাবিনীর পরিবর্ত্তন হয় নাই, তাহাতে অত্যন্ত সুখী হইলাম। আমাদের জন্য ভাবিনী নিজে স্বামীর সহিত নিউ মার্কেট হইতে নানাবিধ ফলমূলাদি কিনিয়া আনিয়াছেন দেখিয়া ভাবিলাম, পিঞ্জরাবদ্ধ বিহগীকে এইবার পরিবর্ত্তনের মধ্যে পাইলাম। অবাক্ হইয়া গেলাম। বহুপূর্ব্বে একসময় যখন ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে উৎসব-উপলক্ষে গিয়া গাড়ীর জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বাহিরে দাঁড়াইতে হইয়াছিল, মনে আছে তখন কৃষ্ণভাবিনী বলিয়াছিলেন, "এমন অনাবৃত স্থানে ১০ মিনিট কাল দাঁড়ান আমার বয়সে এপর্য্যন্ত হয় নাই।" এই বলিয়া অভ্যাস-বশতঃ তিনি নিতান্ত লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই ভাবিনীরই এখন সে পূর্ব্বাভ্যাস অতিক্রম করিয়া নির্ভীক ও স্বাধীনভাবে স্বামী সহ প্রকাশ্য রাজপথে ভ্রমণ

করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা নাই। শিক্ষা রমণীহৃদয়কে যে প্রসারিত করে, চক্ষুর্লজ্জা মানাভিমান যে দূরে পলায়ন করে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় রহিল না। স্পষ্টই বুঝিলাম, শিক্ষায় অন্তর্নিহিত বিবেকশক্তি ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, সঙ্গত অসঙ্গত কার্য্যের বিচার-শক্তিকে স্বতঃই সাহায্য করে, এইজন্যই শিক্ষার এত আবশ্যকতা। অবশ্য স্বভাব মানুষের সর্ব্বোপরি। কাহারও কাহারও স্বভাব শিক্ষাতেও মার্জ্জিত বা সংশোধিত হয় না; পরন্তু কাপট্যের অনুশীলনা ও অহঙ্কারের মাত্রাই অধিক হয়। তাই বলিয়া তাহা ত সকলের নয় ও ইহা হওয়াও আশা করা যায় না।

কৃষ্ণভাবিনীর সেই একমাত্র কন্যা, যাহাকে শ্রীনাথবাবু মাতাপিতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্নেহবশতঃ নিজের কাছে রাখিয়াছিলেন, সে কন্যা ব্যতীত কৃষ্ণভাবিনীর আর সন্তানাদি হয় নাই। শ্রীনাথ-বাবু তাহাকে (তিলোত্তমাকে) আবার অপরিণত-বয়সে এক অসচ্চরিত্র ধনিপুত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া সকল আশা ভস্মাচ্ছাদিত করিয়াছেন। ইহাতে ভাবিনী যে দারুণ আঘাত পাইয়াছিলেন, তাহা তাহার সেই সংক্ষেপোচ্চারিত বাক্যে স্পষ্ট বুঝিলাম। যখন আমি বলিলাম, 'এতদিন পরে যে তুমি সুখী হইয়াছ দেখিলাম, ইহাই আমার পরমানন্দ', তখন ভাবিনী সজল নেত্রে উত্তর দিলেন—"মানুষ সম্পূর্ণ সুখী কখন কি হয়? এক-মাত্র কন্যা, সে জন্ম-দুঃখিনী হইল! একমাত্র সহোদর ভ্রাতা সংসার শূন্য করিয়া অকালে লোকান্তরিত হইলেন!" সে ব্যথিত অন্তরের গভীর শ্বাস, বিষাদপূর্ণ দৃষ্টি দেখিয়া ব্যথিত চিত্তেই বিদায় লইয়া আসিলাম। মনে মনে ভাবিলাম, বিধাতা কি এ ননীর পুতলীকে সংসার-সুখের জন্য সৃষ্টি করেন নাই!

সে-দিন কৃষ্ণভাবিনীর নিকট বিদায় লইয়া ভাবিনী-দর্শনের সুখের সংবাদ কাত্যায়নী-ভবনে জ্ঞাপন করিয়া বাটী ফিরিলাম। কৃষ্ণভাবিনীর বিষয় অনেকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "এই আট বৎসর বিলাতে থাকিয়া তাহার সাজ-সজ্জা, ধরণ-ধারণ, আসবাব-পত্র বড় বড় মেমেদের মতই হইয়াছে বোধ হয়?" আমি হাসিয়া বলিলাম, "তাঁর চেয়ে তোমরা আমরা, বোধ হয়, এ-বিষয়ে বেশী মেম, ও ঘরকন্নার শোভাবর্দ্ধনের জিনিস বেশী আমাদের ঘরে। এ সকল আড়ম্বর তাহার একেবারেই নাই। তাহার স্বামীর লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরি, আর বিদ্যালয়ের বোর্ড, গ্লোব, মানচিত্র, টেবিল, বেঞ্চই গৃহে শোভা পাইতেছে। শয়ন-গৃহে কেবলমাত্র খাট, ভোজন-গৃহে একটী টেবিল ও বাসন রাখার স্থান, কাপড়ের ঘরে আল্না-আলমারী এবং রান্নাঘরে রান্নার ও স্নানের ঘরে স্নানের জিনিস ছাড়া অনাবশ্যক শোভার জিনিস কিছুই দেখিলাম না। তাহাতে আমি তাহার প্রতি আরো শ্রদ্ধান্বিত বোধ করিতেছি। কোনও বিলাত ফেরতের বাড়ী এমন দেখি নাই। অথচ যে-সকল আবশ্যক দ্রব্য রহিয়াছে, তৎসমুদায়ই অতিসুপরিষ্কৃত, পরিচ্ছন্ন ও যত্নে রক্ষিত। হাতেই সে সেলাই করে; কল নাই।"

কৃষ্ণভাবিনীর দৈনিক জীবন দেখিয়া মনে হইল, তাঁহার এই অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, এইরূপ সময়ের সদ্ব্যবহার ও অধ্যয়নশীলতা প্রভৃতি

আমাদের দেশের সকল তরুণ-তরুণী যুবক-যুবতী এবং বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে একবার ডাকিয়া দেখাই। দেবেন্দ্রনাথের বাসভবনের বর্ণনা করিয়া জানিলাম যে, বিলাত গিয়া সকলেই যে শোভা ও সখের জিনিস পছন্দ করেন্ তাহা নয়। বিলাতেও এমন সব বড় বড় বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত আছেন, যাঁহারা আজীবন গভীর গবেষণায় নিমগ্ন থাকিয়া বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার যন্ত্র-পুস্তকাদি ও কেবল জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য দুই একটী জিনিস লইয়াই দিন যাপন করেন্। অনেক সখের জিনিস হইতেই তাহারা স্বেচ্ছায় নিজেকে বঞ্চিত করিয়া থাকেন্। যেমন আমাদের দেশের মহামহোপাধ্যায় বিখ্যাত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ হইয়া থাকেন। দেশভেদে ঐ সকল নিবিষ্টচিত্ত জ্ঞানান্বেষী পণ্ডিতগণের রুচিও প্রায় আমাদিগের দেশের পণ্ডিতগণের ন্যায়। তবে, জাতির ধর্ম্ম কাহার কাহার সঙ্গে অল্পাধিক থাকে।

কৃষ্ণভাবিনী সকল বিষয়েই পণ্ডিত দেবেন্দ্রনাথের সাহায্যকারিণী। স্বামীর শরীর-রক্ষা-বিষয়ে ও প্রফুল্লতা-সম্পাদনে তিনি যেমন যত্নবতী, তেমনি আবার কলেজ-স্কুল চালাইবার জন্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাদির আবিষ্কারক যন্ত্রাদিতেও স্বকার্য্যের মধ্যে সমভাবে নিজশক্তানুসারে স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সাহায্য করেন্। সংসারে দাসদাসীকে সুনিয়মে কার্য্যশিক্ষা-দান করেন্! তাহাদের প্রতি কত সদ্ব্যবহার! একাধারে এত গুণ, এমন স্নিগ্ধ প্রকৃতির মধুরতা আমি কেবলমাত্র একটি স্থল ভিন্ন অন্য কোন রমণীতে দেখি নাই। কেহ তাঁহার গুণের কোন কথা বলিলেই কৃষ্ণভাবিনী অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইতেন্ এবং তাঁহার মুখ ভাব নিতান্ত অপরাধীর মত হইত।

(ক্রমশঃ)

আত্মবিসর্জ্জন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পঞ্চম দৃশ্য।

শ্যামনগর—নরেন্দ্রকৃষ্ণের বাটী।

নরেন্দ্র ও জহরলালের প্রবেশ।

জহ। আমি ত' আপ্‌নাকে বরাবরই বল্‌ছি যে, লোকটা ভাল-মানুষ নয়। আপনি বিশ্বাস করেন্ না, তা' কি কোর্ব্বো? আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, বরং করিম বক্সকে ডেকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখুন্ না! টাকার উপর লোভ ত' আছেই; তা ছাড়া উপ্‌রি নজরও আছে। তা'র জন্যে পদ্মপুখুরে কোন মেয়ে ছেলে জল আন্‌তে যেতে পারে না। সন্ধ্যা-বেলা ঘাটের উপরে ব'সে থাকে, গান গায়, মেয়েছেলে দেখ্‌লে হাসে, ঠাট্টা করে।

নরে। না, না, ও-সব কথা আমি শুন্‌তে চাই না! একদিন গান গাইতে আমি শুনেছিলুম্ বটে, কিন্তু সে ঈশ্বরের নাম কচ্ছিল! আর ওর সে বয়সও নেই!—বয়েসও প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি হবে, বোধ হয়!

জহ। ঐ ত আপ্‌নার দোষ! আপ্‌নার যেমন সরল মন, আপনি সকলকেই সেই রকম দেখেন্। নিজের কানে শুনেও যদি বিশ্বাস না করেন্, তবে আর আমি কি বল্‌ব'

আর বয়েসের কথা কি বল্‌ছেন? ঘাটের মড়া, যমের তলপ্ পড়্‌লেই হয়, এমন বুড়রও দোষ আমি দেখেছি। ওকে ত একটা ছোঁড়া বল্লেই হয়! করিম বল্‌ছিল, মহলে গেলেই তা'র মেয়েমানুষ চাই। আর টাকার জন্যে লোককে এত উৎপীড়ন করে, তা অতিনিষ্ঠুরেও পারে না। পুরুষদের বেত মারে, স্ত্রীলোকদের ধ'রে এনে কাছারী-বাড়ীতে আট্‌কে রেখে দেয়, তাদের প্রতি যথেচ্ছ অত্যাচার করে। এই ক'মাসের মধ্যেই আপ্‌নার বদ্‌নাম রটে গেছে। প্রজারা বলে এ জমীদারের কারসাজি!

নরে। এ কথা বিশ্বাসযোগ্যই নয়। সে এমন নিষ্ঠুর নয়। আমি দেখেছি, কা'কেও ধম্‌কালে পর্য্যন্ত তার প্রাণে আঘাত লাগে। আর সে এ রকম নিষ্ঠুর অত্যাচার ক'র্ব্বে! এ-কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না।

জহ। তবে আর কি ব'ল্‌ব বাবু! চ'খের সাম্‌নে যা দেখ্‌তে পাচ্ছি, তা' কেমন ক'রে অবিশ্বাস কোর্ব্বো? আপনি মনিব, আমি চাকর, আপনাকে কোন কথা বেশী বলা আমার উচিত হয় না, কিন্তু আপনি ছেলে-মানুষ, আমরা বুড়ো হয়ে গেছি। সংসারে লোক-চরিত্র আপনার চেয়ে আমরা ঢের বেশী বুঝ্‌তে পারি।

নরে। আমার বোধ হয়, বদমায়েস প্রজাদের এ সব গড়া কথা! মিছে ক'রে কুৎসা রটাচ্ছে; মনে ক'রেছে, তা হলে আমি ওকে ছাড়িয়ে দোব। এই দেখ না গোবিন্দ-পুর থেকে তোমরা ইদানীং এক পয়সাও আদায় ক'র্ত্তে পার্ত্তে না, হেমবাবু এই ক'মাস এসে প্রায় দেড় হাজার টাকা আদায় ক'রেছেন্। এই সব কারণেই হিংসুটে লোকেরা হিংসা ক'রে তার নামে কুৎসা রটাচ্ছে। এ কথা আমি বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছি।

জহ। (স্বগত) সাধ ক'রে বলি লোকটা যাদুকর! নইলে বাবুর চ'খে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও দেখ্‌তে পায় না। যাই হোক্, আমিও অল্পে ছাড়্‌বো না। (প্রকাশ্যে) গোবিন্দপুর থেকে পাঁচ হাজার টাকা আদায় হয়েছে, আপনাকে দেড় হাজার টাকা দিয়েছে, বাকি সাড়ে তিন হাজার টাকা নিজের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছে। আমি তার প্রমাণ দিতে পারি।

নরে। (বিরক্তভাবে) এ তোমার সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা! আমাকে সে তন্ন তন্ন ক'রে হিসাব দেখিয়ে দিয়েছে।

জহ। আপ্‌নি সরল মানুষ, আপনাকে হিসাব বোঝান খুব সহজ।

নরে। তবে এতদিন তোমরা আমাকে এই রকম ক'রেই হিসাব বোঝাতে বুঝি?

জহ। (স্বগত) কি আপদ্! কেঁচ খুঁড়্‌তে সাপ বেরিয়ে পড়ে যে! (প্রকাশ্যে) কারো বিরুদ্ধে কোন কথা বলা আমার অভি-প্রায় নয়, আমার সঙ্গে হেমবাবুর ত' কোন শত্রুতা নেই? আমি মিছে ক'রে তার নামে দোষ দিতে যাব কেন? তবে কি না, তা'র ব্যাভারে প্রজারা বড় অসন্তুষ্ট হ'য়েছে। আমাকে সকলে অনুরোধ ক'চ্ছে যে, যাতে আমি সকল কথা আপ্‌নাকে বলি। সেই উদ্দেশ্যেই আমার বলা! নইলে আমার দরকার কি?

নরে। (স্বগত) তাই ত! না দেখে

শুনে কা'কেও কিছু বল্‌তে নেই। ভাল ক'রে একবার তদন্ত ক'র্ত্তে হবে। (প্রকাশ্যে) আমাকে যদি এর চাক্ষুষ প্রমাণ দেখিয়ে দিতে পার, তবেই আমি বিশ্বাস কোর্ব্বো, নইলে অনর্থক আমি এ-সব লাগানো কথা শুন্‌তে চাই না।

জহ। তা'র আর ভাবনা কি? তা' যদি না দেখিয়ে দিতে পার্ব্ব, তবে আপ্‌নার কাছে এ-সব বল্‌ব কেন? আমি কি মিছে কথা বল্‌ছি?

নরে। আচ্ছা, যখন দেখাতে পার্ব্বে, তখন বোঝা যাবে।

[প্রস্থানোদ্যত]

জহ। (সহাস্যে) হুঁঃ—বাবা, হয়েছে, ওষুধ ধরেছে। এইবার একটা কিছু যোগাড় ক'রে দেখিয়ে দিতে পার্লেই বস্! বাবু আমার ভিজ্‌তেও যেমন, আবার শুকুতেও তেম্নি! যেম্নি এক কথায় গলেন, তেম্নি আবার এক কথায় চটেন্। তুমি হেম ঘোষ! আমার পথ-বন্ধ ক'রে দাঁড়াবে? আমি ত্রিশ বচ্ছর প্রজা ঠেঙ্গিয়ে এম্‌নি ক'রে টাকা আদায় ক'র্চ্ছি!—নইলে আমায় যাবজ্জীবন কুঁড়ে ঘরেই কাটাতে হ'ত। তুমি কোন্ ক্ষুদ্র কীট রে, তুমি আমার উন্নতির পথ রুদ্ধ কোর্ব্বে? যে আমার সামনে দাঁড়ারে, তা'কে এম্‌নি ক'রে পিপড়ের মতন পিষে ফেল্‌ব। সাবধান! হেম ঘোষ সাবধান! সরে দাঁড়াও।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠদৃশ্য।

(নন্দলালবাবুর বহির্ব্বাটী। নন্দলালবাবু পাদচারণা করিতেছেন)

নন্দ। কথাবার্ত্তা ত' এক রকম ঠিক্ হ'য়েই গেছে, এখন বিয়েটা হয়ে গেলে বাঁচি। নগদ টাকা অনেক পাওয়া যাবে, তা ছাড়া বিলেত যাবার খরচটাও ঘর থেকে দিতে হবে না। লাভ কত! এখন ভগবানের ইচ্ছেয় হ'লে হয়! অমন মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিতে কত লোক ঝুঁকে পড়্‌বে। এদিকে আবার আজকালকার ছোঁড়াগুলোও কেমন এক রকমের হ'য়ে উঠেছে। "দেশ" "দেশ" "সমাজ" "সমাজ" ক'রে ছোঁড়াগুলো সব ক্ষেপে উঠেছে! চারিদিকেই কেবল শুন্‌তে পাই, "বর পণ নিও না," "মেয়ে বড় ক'রে রাখ"। আরে বাবু, চিরকাল যা হয়ে আস্‌ছে, —তা' কি তোরা আজ মিটিং ক'রে লেক্‌চার ঝেড়ে-উঠিয়ে দিবি? হুঁঃ! তা হলে আর ভাব্‌না ছিল না। আর বাবু, তোদের লাভই বা কি? ছেলের বিয়ে দিয়ে দু'পয়সা পাব, তা' তোদের এত চক্ষুঃশূল কেন? আমার পাওনার আশাটা খুবই কম! যাদের পাঁচটা থাকে, তাদের তবু পাঁচবার পাবার পিত্তেস থাকে! আমার ত' আর তা নেই! ঐ একটা ছেলে, ওর বিয়েটা হয়ে গেলেই বস্। বি, এন্ মজুমদারের মেয়ের সঙ্গে হ'লে, তবু মন্দ হবে না, এ-রকম দাঁও জোটান বড় শক্ত হবে!

(মণীন্দ্রের প্রবেশ)

কে তুমি? কাকে খুঁজ্‌ছ?

মণীন্দ্র। আপনার কাছেই একবার এসেছি।

নন্দ। কেন? কি দরকার?

মণীন্দ্র। দরকার? আজ্ঞে—দরকার আমার এমন কিছু নয়; আপনাকে একটা কথা বল্‌তে এসেছিলুম্।

নন্দ। কি কথা?

মণীন্দ্র। আপনার ছেলে প্রফুল্ল একজন গোঁড়া দেশভক্ত হয়ে পড়েছেন, তা বোধ হয়, আপনি কিছু কিছু জান্‌তে পেরে থাক্‌বেন্। তিনি সর্ব্বদাই দেশের কথা, সমাজের অত্যাচারের অবিচারের কথা আলোচনা করেন্। আজকালকার দিনে ও সমস্ত ভাল নয়। আপ্‌নি একটু বারণ ক'রে দেবেন্। আমরা পাড়াপ্রতিবেশী, ওঁর যা'তে মঙ্গল হয়, তা দেখা উচিত। (প্রস্থানোদ্যত) হ্যাঁ, আর একটা কথা শুন্‌লুম্, তিনি হেম ঘোষের মেয়েকে বিয়ে ক'র্ব্বেন ব'লে স্থির ক'রেছেন। তা'দের অবস্থা এখন খুবই খারাপ। টাকা-কড়ি কিছুই দিতে পার্ব্বে না। সেই জন্যেই তার মেয়ের বিয়ে হ'চ্ছে না। ইনি তাই তা'কে বিয়ে কর্ব্বেন্। প্রায় সর্ব্বদাই তিনি তা'দের বাড়ীতে থাকেন্। আপনি কি এ কথা শোনেন্ নি?

নন্দ। (স্বগত) অ্যাঁ, কি সর্ব্বনাশ! আমার এত আশা সবই কি নিষ্ফল হবে? পাজী ব্যাটা, ছুঁচো ব্যাটা, আমার অমতে বিয়ে ক'র্ব্বে? (প্রকাশ্যে) তা' এ খবরটা আমাকে দিতে আস্‌বার উদ্দেশ্য?

মণীন্দ্র। আমার উদ্দেশ্য কিছুই নেই। তবে আজকালকার বিয়ের বাজার যে-রকম প'ড়েছে, আপনার এমন বিদ্বান্ ছেলে, আপনি কিছু পাবেন্ না, ঠক্‌বেন্, সেটা কি আমরা দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে পারি? আমরা পাড়া-পড়্‌সী—আপনার যাতে ভাল হয়, তা আমাদের দেখা উচিত। তাই আপনাকে বল্‌ছি, নইলে আমাদের কি দর্‌কার বলুন্?

নন্দ। তুমি বড় জ্ঞানবান্ লোক, বাবা। তোমার নাম কি?

মণীন্দ্র। আজ্ঞে আমার নাম শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায়। আমার পিতার নাম ৺ কালীচরণ রায়। তাঁকে, বোধ হয়, আপনি চিন্‌তেন্।

নন্দ। ওঃ—খুব চিন্‌তুম্! তিনি অতি-মহৎ লোক ছিলেন। তাঁর মতন ধার্ম্মিক লোক অতিশয় অল্পই দেখ্‌তে পাওয়া যায়। তোমাদের ও-দিকে আমি ত বড় একটা যাই আসি না। আমি তোমাকে স্পষ্ট চিন্‌তুম্ না, সেজন্যে কিছু মনে কোরো না, বাবা! ছেলে বেলায় তোমায় দেখেছি। এখন বড় হয়েছ। তুমি বড় সৎলোক, তা' তোমার কথাবার্ত্তায় বুঝ্‌তে পার্চ্ছি। তা' হবে না? কেমন লোকের ছেলে তুমি! এ খবরটী দিয়ে তুমি আমার বড় উপকার ক'র্লে। আমি এই মাসের ভিতরে প্রফুল্লর বিয়ে দোব।

মণীন্দ্র। আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই করুন্! আপনার ছেলে যদি এ রকম ভাবে বিয়ে করেন্,—আপনারও ক্ষতি, সমাজেরও ক্ষতি! তার দেখাদেখি আর পাঁচজনেও ক'র্ত্তে পারে। তা হ'লে ক্রমেই এই রকম দাঁড়িয়ে যাবে। লোকে ছেলের বিয়ে দিয়ে যা দু'পয়সা পেত', সেটা তা হ'লে ক্রমশঃ উঠে যাবে।

নন্দ। হ্যাঁ, তাই ত' বাবা, তাই ত! তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি বেশ বাবা! আজকাল্‌কার কতকগুলো ছোঁড়া হ'য়েছে ঐ রকম; মাথা মুণ্ড কি যে কোর্ব্বে তারা তা' ভেবেই পায় না। কেবল লাফিয়ে বেড়ায়!

মণীন্দ্র। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিও ত তাই বলি। আমি তবে এখন চল্লুম্। এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলুম্, মনে কর্লুম্, খপরটা আপনি জানেন্ কি না, দেখে যাই।

নন্দ। বেশ ক'রেছ, বেশ ক'রেছ।

মণীন্দ্র। হ্যাঁ, আর একটা কথা। আমি যে আপ্‌নাকে এ খপর দিয়ে গেলুম্, তা প্রফুল্লবাবুকে বলবেন্ না। তা হ'লে হয় ত তিনি আমার উপর রাগ ক'র্ব্বেন্। (স্বগত) কি জানি বাবা, সে যে ছেলে, এখনও ঘাড়টা সোজা ক'র্ত্তে পারি না।

নন্দ। রাধা মাধব! তা কেন বল্‌তে যাব? সেজন্যে তোমার কোন ভাবনা নেই।

মণীন্দ্র। তা' হ'লে আমি এখন আসি।

(সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইল।)

নন্দ। হ্যাঁ, এস বাবা, এস, তুমি বড় ভাল ছেলে।

(মণীন্দ্রের প্রস্থান, অপর দিক্ দিয়া প্রফুল্লের প্রবেশ)।

প্রফু। ও লোকটা বেরিয়ে গেল, কে বাবা?

নন্দ। ও একটা ভদ্রলোকের ছেলে।

প্রফু। মণি রায়ের মতন না?

নন্দ। তবে ত জানই বাপু, আর জিজ্ঞাসা ক'র্চ্ছ কেন?

প্রফু। লোকটা ভারি বদ্। কি ক'র্ত্তে আপনার কাছে এসেছিল?

নন্দ। ও একটা কাজের জন্যে আমার কাছে এসেছিল। সব কথাই যে তোমাদের কাছে বল্‌তে হবে, তার ত কোন মানে নেই?

প্রফু। লোকটা অতি পাজী!

নন্দ। ও ত তোমার কোন অনিষ্ট করে নি, বাপু, তবে ওর সম্বন্ধে তোমার এমন ধারণা কেন? আমাদের চুল পাকল, আমরা কি আর লোক চিন্তে পারি না?

প্রফু। হতে পারে, কিন্তু আমি আপনার চেয়ে ওকে বেশী জানি।

নন্দ। তোমাদের আজকালকার ছেলেদের স্বভাবই কেমন বেশী কথা কওয়া। তোমাদের সঙ্গে কথা না কওয়াই ভাল।

[প্রস্থান।

প্রফু। ওটার মুখ দেখলে ঘৃণা হয়! রমার উপর অত্যাচারের কথা মনে হ'লে সর্ব্বশরীর জ্বলে ওঠে। অপমানে লজ্জায় রমা সেই থেকে কেমন হয়ে গেছে। ওটা পিশাচেরও অধম। ওর স্ত্রীর জন্যেই সেদিন ওকে জেলে ছেড়ে দিয়ে এসেছিলুম। সেই আমাকে রমার কথা ব'লে পাঠায়, সঙ্গে সঙ্গে স্বামীকে রক্ষা কর্ব্বার জন্যেও অনেক অনুরোধ করে। সেই জন্যেই আমি সে-দিন ওকে ছেড়ে দিয়ে এসেছিলুম, নইলে ও-রকম বদ্‌মায়েসকে একটু ভাল রকম শিক্ষা দেওয়া উচিত। ওর অসাধ্য কিছু নেই। কি জানি কি ক'র্ত্তে আবার বাবার কাছে এসেছিল! কোন ষড়যন্ত্র ক'র্ত্তে এসেছিল কি? নাঃ!—ব্যাপার ক্রমশঃ জড়িয়ে আস্‌ছে! অদৃষ্টে কি আছে জানি না। আচ্ছা, দেখাই যাক্ কি হয়? সে-জন্যে ভাবনা মিছে। আমি আমার কাজ ক'রে যাই।

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

(মণীন্দ্রের অন্তঃপুর। লীলার শয়ন-কক্ষ।—কুসুমশয্যা—লীলা ও পরিচারিকা।)

লীলা। কই, তিনি এসেছেন্ কি?

পরি। না, বৌদিদি! আসেন্ নি।

লীলা। কাকা ফিরে এসেছেন?

পরি। না, তিনিও আসেন্ নি। কেন বৌদিদি, তুমি সে-দিন সে মেয়েটাকে ধ'র্ত্তে গেছ্‌লে? সেই থেকেই ত' দাদাবাবু একে-

বারে বাড়ী আসা বন্ধ ক'রেছে। আগে তবু যাই হোক্ এক আধ্ বার আস্তেন্।

লীলা। নাই আসুন্, যে-খানে থাকুন্ ভাল থাকুন্! তবে মরণকালে একবার দেখ্তে পেলুম না, এই আপশোষ!

পরি। ছি:—ওকি কথা বৌদিদি! অসুখ ক'রেছে, ভাল হ'য়ে যাবে। তার ভাবনা কি? নাও, এই ওষুধটা খেয়ে ফেল।

লীলা। দেখ্, আমার যখন শ' জ্বল্বে, তখন তোর ঐ ওষুধটা আমার সেই শ'য়ে ঢেলে দিয়ে আসিস্।

পরি। বুকের ব্যথাটা কেমন আছে?

লীলা। বুকের ব্যথা বড্ড। নিঃশ্বাস ফেল্তে পাচ্ছি না। কথা কইতে পাচ্ছি না। এ ব্যথা কি আর সার্বে? এ আমার সঙ্গের সাথী।

পরি। আহা! দাদাবাবু কি গা! এমন কর্লে যে বুকের ব্যথা আর সার্বে না!

লীলা। তাঁর দোষ কি? আমার অদৃষ্টের ফল। পুরুষে যা চায়,—রূপ, ভগবান্ আমাকে তা'তে বঞ্চিত ক'রেছেন। তাই ত তাঁর আমাকে মনে ধরে নি। এতে তাঁর দোষ কি? আমি ত তাঁর দোষ একটুও দেখ্তে পাই না।

পরি। আহা, এমন লক্ষ্মী বৌ গা! আর তা'র কপালে এত কষ্ট?

লীলা। মা কোথায়?

পরি। তোমার জন্যে স্বস্ত্যেন হবে, তিনি তাই তার উয্যুগ ক'রে দিচ্ছেন্।

লীলা। আমার জন্যে স্বস্ত্যেন হবে? আমার এ মরণকালে স্বস্ত্যেন ক'র্লে কি হবে? তার চেয়ে আমায় হরিনাম শোনালে ফল হ'ত?

(জয়াবতীর প্রবেশ)

লীলা। মা, মা! (রোদন)

জয়া। কি মা? (লীলার মস্তকের নিকট বসিয়া) কেমন আছ আজ? একটু ভাল আছ কি?

লীলা। না মা, ভাল আর আমি হব না। আমার শেষ হ'য়ে আস্ছে। আমি বেশ বুঝ্তে পাচ্ছি, আমার আর দেরী নেই।

জয়া। ও-কি কথা মা! ছিঃ!—তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী, তোমারই ত ঘরসংসার মা! (স্বগত) মণের যে কি মতিচ্ছন্ন ধ'রেছে, এমন লক্ষ্মী বৌকেও এমন হতশ্রদ্ধা করে! বাছা আমার তারই জন্যে দিন দিন শুখিয়ে যাচ্ছে। (প্রকাশ্যে) ডাক্তার যে ওষুধটা দিয়ে গেল, সেটা খেয়েছ কি মা?

লীলা। না মা, আর ওষুধ খেয়ে কি হবে? এই ক'মাস ধ'রে ক্রমাগত ত ওষুধ খাচ্ছি মা! কিছুই ত' হ'ল না। আমি বুঝ্তে পাচ্ছি, আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে।

জয়া। (অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া) বালাই! ভাল হবে। ভয় কি?

লীলা। ভাল হ'তে আর ইচ্ছে নেই মা! পায়ের ধুলো দাও, আশীর্ব্বাদ কর, আর জন্মেও যেন আমি তোমার বৌ হ'তে পারি। যেন তোমার মতন শাশুড়ী পাই। মা!—

জয়া। কি মা?

(লীলা নীরব)

জয়া। কি মা, কি বল্ছিলে, বল্তে বল্তে চুপ ক'র্লে কেন?

লীলা। কাকা ফিরে এসেছেন?

জয়া। কই, না মা! বোধ হয়, এখনও

আসেন্ নি। (পরিচারিকার প্রতি) যা ত' দেখ্ ত' ঠাকুর-পো এসেছে কি না।

[পরিচারিকার প্রস্থান।]

লীলা। (স্বগত) স্বামী, প্রভু! দুঃখিনীর আরাধ্য দেবতা! এ-সময়ে একবার দেখা দেবে না? জন্মের শোধ একবার তোমায় শেষ দেখা দেখে নিতুম, তোমার পায়ের ধুলো একটু নিয়ে মাথায় দিতুম্, আমার সে আশা কি মিটবে না? এ সময়ে একটী বার দেখ্‌তে পেলে, তোমার একবিন্দু পায়ের ধুলো মাথায় দিতে পালে, আমার সমস্ত জীবনের আক্ষেপ মিটে যাবে। তাও কি পাব না?

(ধীরে ধীরে ভোলানাথের প্রবেশ)

লীলা। কাকা, কাকা।

ভোলা। কেন মা আমার?

লীলা। কাকা,—

ভোলা। মা, মা, তোর মনের কথা বুঝ্‌তে পেরেছি। পার্লুম না মা, তাকে কিছুতেই আন্‌তে পার্লুম না! মা, তোর জন্যে এমন কুস্থান নেই যে আমি যাই নি। আমি সে দুর্বৃত্তের সকল আড্ডা খুঁজে দেখেছি,—কোথাও তাকে দেখ্‌তে পেলুম না। শেষে একজনের কাছে শুন্‌লুম, পরশুদিন কতকগুলো ছোঁড়ার সঙ্গে জুটে কুলাঙ্গার কাশী গেছে।

লীলা। ওঃ!—

ভোলা। মা, তোর ও দীর্ঘনিঃশ্বাসে আমার বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে, প্রাণ ফেটে বেরুচ্ছে। কিন্তু কি কর্ব্বো মা, আমার উপায় নেই। আমি তোর শেষ অনুরোধ রাখ্‌তে পার্লুম না।

লীলা। কাকা, তোমার পায়ের ধুলো আমায় দাও। আমি অনেক পুণ্য ক'রে তোমাদের বৌ হ'য়েছিলুম্। আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, আমি চল্লুম্।

ভোলা। কোথায় যাবি মা! কুললক্ষ্মি! আমার আঁধার ঘরের প্রদীপ, তুই ভিন্ন আমার যে আর পুত্রকন্যা কিছুই নেই মা! আমাকে ফেলে রেখে তুই কোথায় যাবি?

লীলা। কাকা, কেঁদ না, আমায় পায়ের ধুলো দাও। (ঐ আমার মা এসেছেন,—আমায় নিতে!—মা ডাক্‌ছেন্, বল্‌ছেন, 'এ সংসারে বড় জ্বালা, আমার কাছে আয়,—শান্তি পাবি।'

জয়া। মা,—মা, আমিই ত তোর মা। সাত বছরের মেয়ে বিয়ে দিয়ে এনে মানুষ ক'চ্ছি।

লীলা। মা, মা, পায়ের ধুলো দাও মা! (পদধূলি গ্রহণ করিয়া) কাকা, মানুষের বাসনার সীমা নেই। কারও সকল বাসনা পূর্ণ হয় না। আমাকে হরিনাম শোনাও—নারা-য়ণ! (মৃত্যু)

জয়া। একি ঠাকুর-পো, আর যে মা আমার কথা কইছে না। একি হ'ল! (রোদন)

ভোলা। হায়! সব শেষ! আর কে কথা কইবে? অকালে ননীর পুতুল সংসারের তাপে গলে গেল! নরাধম লম্পটের হাতে প'ড়ে সতী লক্ষ্মী নিজের মহত্ত্ব দেখিয়ে স্বর্গে চ'লে গেল। (রোদন)।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

মাতৃক্রোড়ে শিশু।

তপ্ত দিবসের স্নিগ্ধ-বটচ্ছায়া-প্রায়
ছবি এক নয়ন জুড়ায়,
তীব্র সন্তাপের মাঝে শান্তির বারতা,
অবিরাম কলরবে ক্ষণ-নীরবতা,
ক্লান্ত জীবনের সুখ-স্বপনের কথা!—
মাতৃ-অঙ্কে শিশুটী ঘুমায়!

নিবিড় কানন-মাঝে আশ্রমের মত
ছবিখানি কি সুন্দর, পূত!—
হিংসা দ্বেষ স্বার্থচিন্তা হ'তে বহুদূরে,
কলুষ ক্ষণের তরে পশিতে শিহরে,
বাৎসল্যের উৎসধারা উথলিয়া ঝরে
মরম পরশি' অবিরত!

আবিল মরত-মাঝে স্বরগ রেখায়
ফুটায়েছে বিধি তুলিকায়,—
আছে যেন মমতার কল্পতরু হ'য়ে,
পুণ্যের মন্দারজ্যোতিঃ সতত ধরিয়ে,
শান্ত-মন্দাকিনী মত ভাসায় হৃদয়ে
কি মাধুর্য্যে, কিবা করুণায়!
মাতৃ-অঙ্কে শিশুটী ঘুমায়!

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

অনাদি গান।

প্রভূত দিলে হে মান,
বাঞ্ছা তোমার শুনিতে এ ছার
অকিঞ্চনের গান!
গাহি তবে গান পরাণ খুলিয়া,
পারি যত খানি কণ্ঠ তুলিয়া,
রাখিব না আর লাজে আগুলিয়া
শিক্ষা-বিহীন তান!
হরত রাগিণী উঠিবে চড়িয়া
কিংবা যাবে সে গভীরে পড়িয়া,
তথাপি নারিব পরাণ ধরিয়া
ফিরাতে তোমারি দান!
একদা কি গান উঠিয়া স্বপনে
ফুটায়ে তুলিল চন্দ্র-তপনে,
চাহিল গভীর সুর-আলাপনে
বিশ্ব মেলি' নয়ান!

গগনে পরমানন্দ-হিলোলে
নাচিল হৃদয় নীলিম-নিচোলে,
জাগিল গন্ধ-বরণ-বিলোলে
ছন্দে অনাদি প্রাণ!
কণ্ঠ ফুটিল সেতার-সুতারে
রাগিণী ছুটিল উদারে মুদারে
মুগ্ধ মানব-হৃদয় ফুকারে
অবিচারী ভগবান্!
আপনার ভাবে চলেছি কাঁদিয়া
জগত-জনার করুণা সাধিয়া
আপনারে শুধু মিথ্যা ধাঁধিয়া
করিতেছি অপমান!
বুঝিয়াছি সার এ ভাব তাঁহার
যে জন সুর-নিধান!

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও
শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩২ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।